ক্ষুদ্র জাতিসত্তার খবর জানানো

কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা
ফারহানা আফরোজ

ক্ষুদ্র জাতিসত্তার খবর জানানো

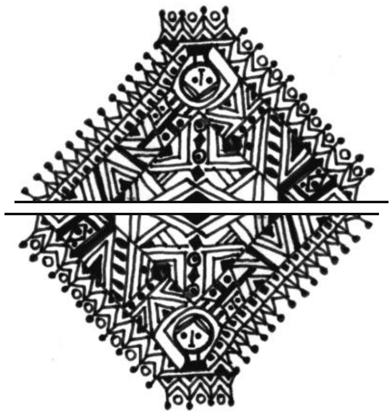

কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা
ফারহানা আফরোজ

Supported by Switzerland
In partnership with Canada
NAGORIKATA
MRDI

© মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

প্রকাশকাল : ২০০৯
২য় সংস্করণ : ২০২৬

আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-০৬২০-৮

বাংলাদেশে মুদ্রিত

মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮ ০২ ৪১০২২৭৭২-৭৪, ইমেইল : info@mrdibd.org
ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

বিষয়সূচি

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে ৪
ভূমিকা ৫

সাংবাদিকদের জন্য
১. বৈচিত্র্যে সম্মিলন, সম্মিলনে বৈচিত্র্য ৮
২. অস্তিত্ব, সমস্যা, বঞ্চনা জানা এবং জানানোর কেন্দ্রবিন্দু ১০
৩. ক্ষুদ্র জাতিসত্তার খবরাখবর প্রতিফলনে ঘাটতি ১৪
৪. পথের খোঁজ ভালো সাংবাদিকতায় ১৮
৫. প্রতিবেদন করার সুযোগ ২৫
৬. সতর্কতার কয়েকটি ক্ষেত্র ও কৌশল ৩০

আদিবাসী সংস্থা-সংগঠনের জন্য
১. আদিবাসী প্রতিনিধিদের করণীয় ৩৬
২. বোঝাপড়া, সম্পর্ক গড়া ৩৭
৩. সাংবাদিকের চোখ দিয়ে দেখা, দেখানো ৪১
৪. সাংবাদিককে তাঁর কাজে সহায়তা করা ৪৫
৫. সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগের পরিকল্পনা ৪৮
৬. প্রেস কনফারেন্স বা সংবাদ সম্মেলন ৫৯

তথ্যকণিকা
বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ৬৪
আদিবাসী সংস্কৃতি ৭৯
আদিবাসী-সংশ্লিষ্ট কিছু আইন, নীতিমালা ও পরিকল্পনা ৮৪
ওয়েবসাইটে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ৮৯
সহায়ক তথ্যপঞ্জি ৮৯

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

বইটি প্রকাশের পর ১৬ বছর পেরিয়ে গেছে। এটি হালনাগাদ করা অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রয়োজনীয় সম্পাদনা এবং যোগবিয়োগ করেছি। তথ্যকণিকা অংশে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার পরিচিতিতে বেশ কিছু নতুন তথ্য ঢুকেছে। আদিবাসী-সংশ্লিষ্ট আইনের তালিকাটিও বড় হয়েছে। এ ছাড়া, কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়ায় এ বিষয়ের ওয়েবসাইটের তালিকা এবং প্রাথমিক যোগাযোগের তালিকা বাদ দিয়েছি। প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকে এগুলোর উল্লেখ ছেঁটে ফেলেছি। দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে জরুরি কিছু পরামর্শ দিয়েছেন আদিবাসী নেতা ও মানবাধিকারকর্মী সঞ্জীব দ্রং। তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ।

দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হচ্ছে মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)-এর 'স্ট্র্যাটেজিক টুগেদারনেস ফর ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্পের একটি কার্যক্রম হিসেবে। ২০২৪-২০২৭ সালব্যাপী এ প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে 'নাগরিকতা: সিভিক এনগেজমেন্ট ফান্ড (সিইএফ)' কর্মসূচির আওতায়। এতে অর্থায়ন করেছে বাংলাদেশে সুইজারল্যান্ডের দূতাবাস, গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা এবং বাংলাদেশে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ডেলিগেশন।

ভূমিকা

এ বইয়ের উদ্দেশ্য, ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের দূরত্ব দূর করার উপায়গুলো খতিয়ে দেখা। বইটি তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশ বিষয়টিকে দেখছে সাংবাদিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে। এ অংশটিতে সাংবাদিকদের ভাবার জন্য কিছু বিষয় এবং কাজের সুবিধার জন্য কিছু পরামর্শ আছে। দ্বিতীয় অংশটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠন ও প্রতিনিধিদের জন্য। সেখানে তাঁদের ভাবার জন্য কিছু বিষয় এবং সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কার্যকরভাবে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য কিছু পরামর্শ আছে। এ দুই অংশ যাদের জন্য, তারা দুই পক্ষ মিলে দূরত্ব ঘোচানোর কঠিন কাজটি সম্পাদন করবে, এটাই আশা।

তৃতীয় বা শেষ অংশটিতে পাবেন কিছু তথ্যকণিকা: বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার পরিচিতি; কয়েকটি জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বড় পরব ও আচার-অনুষ্ঠানের তালিকা; আদিবাসীদের জন্য প্রাসঙ্গিক কিছু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইন। যেসব বইপত্র থেকে তথ্য-উপাত্ত নেওয়া হয়েছে, সেগুলোর একটি তালিকাও তৃতীয় অংশে পাবেন। এ গ্রন্থপঞ্জি আদিবাসী বিষয়ে তথ্যের কিছু ভালো উৎসের হদিস দেবে।

বইটি লিখবার সময় জরুরি কিছু অংশ খুঁটিয়ে পড়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন নৃবিজ্ঞানী ও উন্নয়নকর্মী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক প্রশান্ত ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল্লাহ্ আল ফারুক। বাজারে দুষ্প্রাপ্য একটি বই পাঠিয়ে বিশেষ সাহায্য করেছেন বইটির লেখক মণিপুরী ললিতকলা একাডেমির পরিচালক রামকান্ত সিংহ। তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ।

এ ছাড়া, বইটির পরামর্শের অনেকগুলো এসেছে ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ[১]- এমআরডিআইয়ের একটি প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত তিনটি কর্মশালা, সংবাদমাধ্যমের আধেয় বিশ্লেষণ[২] এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে। এ প্রকল্পের নাম ছিল 'ব্রিজিং মিডিয়া অ্যান্ড এথনিসিটি—সংবাদমাধ্যম ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যকার দূরত্ব দূর করা। ২০০৮-০৯ সালের এ প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে বাংলাদেশে ইউরোপিয়ান কমিশনের ডেলিগেশন। সার্বিক সহায়তার জন্য প্রকল্পটির সঙ্গে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ।

---

[১] বর্তমান নাম: মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ

[২] বর্তমান প্রকল্পের আওতায় ২০২৫ সালে অনুরূপ একটি আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কাজটি চূড়ান্ত না হওয়ায় এখানে সে তথ্য দেওয়া গেল না। তবে প্রকাশিত হলে এমআরডিআইয়ের কাছে সেই প্রতিবেদন পাওয়া যাবে।

সাংবাদিকদের জন্য

১

বৈচিত্র্য সম্মিলন, সম্মিলনে বৈচিত্র্য

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বলতে সেসব সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতির ধারা, ধর্ম বা বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান এবং ঐতিহ্য রয়েছে। বাংলাদেশে বাঙালিদের পাশাপাশি এমন অনেকগুলো জাতির মানুষ বসবাস করে। এসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের মোট জনসংখ্যা বাঙালি জনগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক ছোট। আবার, এমন স্বতন্ত্র জাতিদের বেশির ভাগের জনসংখ্যা একেবারেই কম।

প্রান্তিক অবস্থানের এ মানুষদের সমস্যা ও সংকটগুলো কিন্তু ছোট নয়। তাদের জাতিগত ও অবস্থানগত স্বাতন্ত্র্যের কারণে বাঙালি প্রান্তিক মানুষের চেয়ে তাদের সমস্যা এবং অবহেলা-বঞ্চনার মাত্রাগুলো জটিল; আছে জীবিকার সংকট ও অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক ও ক্ষমতাশালী স্বার্থের সঙ্গে দ্বন্দ্ব; আছে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অস্তিত্ব টিঁকে থাকার সংকট; ওঠে নিজেদের মতো করে বেঁচে থাকার অধিকারের মৌলিক প্রশ্ন।

নৃবিজ্ঞানীরা বলেন, বাঙালি জাতির উৎপত্তি ও গঠনে মিশে আছে এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অনেকের পূর্বসূরিরা। বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারায় এসে মিশেছে তাদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বিভিন্ন সময়ে জমিদারি ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী সংগ্রাম এবং পরে বাংলাদেশের মুক্তির আন্দোলনে তারাও শরিক ছিল। এ জাতিদের সম্পর্কে জানা তাই এ অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে পূর্ণাঙ্গ করে জানা।

তাদের ঐতিহ্য, মর্যাদা, স্বার্থ বা অধিকারের প্রশ্নগুলো তাই শুধু তাদের জন্য জরুরি নয়, বাঙালি জনগোষ্ঠীর জন্যও তা জরুরি বিষয়। ইতিহাসবিদ ও নৃবিজ্ঞানীরা যেমন অতীত ও ক্রমবিকাশে নজর দেন, সাংবাদিক দেখবেন এদের নিকট অতীত ও চলতি বর্তমানের ধারা—অবস্থা ও অবস্থান।

ক্ষুদ্র জাতিসত্তার খবর জানানো কেন জরুরি

- সাংবাদিক মানুষের জীবন, প্রয়োজন ও আগ্রহের সঙ্গে জড়ানো ঘটনা ও বিষয়ের সত্যচিত্র প্রেক্ষাপটসহ যথাযথ তুলে ধরবেন। নিত্যনতুন নানা রকম ঘটনা মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। সাংবাদিক মানুষের জন্য জরুরি সেসব ঘটনা বা প্রবণতার কথা এমনভাবে জানাবেন, যাতে মানুষ বিষয়গুলোর তাৎপর্য সঠিক বুঝতে এবং কার্যকরভাবে সেগুলোর মোকাবিলা করতে পারে। মানুষ যেন জেনে-বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে পারে; জরুরি জনমত, তর্ক-বিতর্ক এবং পদক্ষেপের ভিত্তি তৈরি হয়।

শুধু খারাপ ঘটনা নয়, ভালো ঘটনার কথাও জানানো জরুরি। সেগুলো আশা-অনুপ্রেরণা জাগায়, সম্ভাবনার পথ দেখায়।

- ✓ সমাজের নানা অংশ, তাদের নানা রকম জীবন; সেসব জীবনের নানা রকম প্রয়োজন ও আগ্রহ। সাংবাদিক যার জরুরি খবর জানান না, সে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।
- ✓ জীবন কেবল মানুষকে নিয়ে নয়। ভালো জনজীবনের জন্য প্রাণ, প্রকৃতি, পরিবেশ, প্রতিবেশী—সবই জরুরি খবর।

- আবার, একের জীবন অন্যের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। সাংবাদিকের কাজের মাধ্যমে মানুষ ঘটনার তাৎপর্যের সে যোগসূত্র বুঝতে পারে।
    - ✓ প্রত্যেকে ভালো না থাকলে সবাই মিলে ভালো থাকা সম্ভব নয়। ন্যায্যতার বিষয়টি জরুরি বিবেচনা। সাংবাদিক যখন কোনো ঘটনা বা প্রবণতার হানিকর বা খারাপ দিকগুলো দেখান, তখন তার প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত হয়। ভালোর জন্য পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সূচিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।
    - ✓ ইতিবাচক খবরের আশা-আনন্দ-অনুপ্রেরণা সবার মধ্যে সঞ্চারিত হয়।
    - ✓ সাংবাদিক যেসব ঘটনা বা বিষয়ের কথা তুলে ধরেন, সেগুলো সমাজের মানুষের নজরে ও বিবেচনায় আসার সুযোগ পায়। যাদের তিনি উপেক্ষা করেন, তাদের কথা বেশির ভাগ মানুষের অজানা রয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়। তারা এবং তাদের সমস্যা এবং ইতিবাচক খবর সমাজের মনোযোগ পাওয়ার সুযোগ হারায়। কার কোন কথা, কোন ঘটনা বা বিষয় কীভাবে তিনি তুলে ধরছেন, সেদিকটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।
- সুতরাং সাংবাদিকের কাজ ব্যক্তির এবং সমাজের ভালো জীবনের জন্য জরুরি। জনজীবনের কল্যাণের ব্রত আর জনস্বার্থের সুরক্ষা সাংবাদিকের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অত্যাবশ্যক ভিত্তি।
    - ✓ এরই যুক্তিতে সাংবাদিকের তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সুযোগগুলো জায়েজ হয়।
    - ✓ এরই যুক্তিতে সাংবাদিক যেকোনো ক্ষমতাকেন্দ্রের নজরদারি করেন, জনমানুষের চোখ-কান-মুখ হয়ে সরকারসহ ক্ষমতাকেন্দ্রগুলোর সঙ্গে তথ্য-মতামত আদান-প্রদান এবং যোগাযোগের সেতু গড়েন। গণতন্ত্র যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায়।

নৈতিক, ন্যায্য– সাংবাদিকতার নৈতিকতার তাই দুটি বড় দাবি:

- জনজীবনের কল্যাণের লক্ষ্যে সংবাদমাধ্যমে সমাজের সব অংশের ন্যায্য প্রতিফলন নিশ্চিত করা।
- যারা দুর্বল, সুযোগ-সুবিধায় যারা পিছিয়ে আছে, যারা কোনো অন্যায়, বৈষম্য বা বঞ্চনার শিকার; তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ। আরও মনে রাখা যে, জনস্বার্থ কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ নয়।

ওপরের দুটি বিবেচনাতেই ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের জন্য জরুরি বিষয়গুলো সাংবাদিকের বিশেষ মনোযোগ দাবি করে।

- ✓ সরকারসহ ক্ষমতার বিভিন্ন কেন্দ্রকে এসব জানানো জরুরি।
- ✓ এসব সমস্যা ক্ষমতাকেন্দ্রের সৃষ্ট হলে সব মানুষকে তা জানানো জরুরি।
- ✓ এসবের প্রতিকার যার দায়িত্ব, তাকে চিহ্নিত করা জরুরি। আড়াল পেলে দায় এড়ানো বা অবহেলার সুযোগ হয়।
- ✓ যেটুকু যা ভালো ঘটে, সেগুলোও সবাইকে জানানো জরুরি। সেটা সম্ভাবনার পথ দেখায়।

সাংবাদিক সচেতন ও সচেষ্ট না থাকলে মূলধারার খবরের প্রবল উপস্থিতির চাপে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের কথা হারিয়ে যাবে।

অবহেলা, অস্থিতিশীলতা– ব্যক্তি বা ছোট গোষ্ঠী যখন সমস্যার মধ্যে থাকে বা কোনো অন্যায়ের শিকার হয়, সেটা বৃহত্তর সমাজ, রাষ্ট্র বা জনজীবনের জন্যও ক্ষতি ডেকে আনে।

- ✓ একজন ব্যক্তির প্রতি অন্যায্যতা হলে সেটা সবার প্রতি হওয়ার পথ খুলে যায়।
- ✓ যেকোনো সমস্যা বা অন্যায্যতা জিইয়ে থাকলে ক্ষোভ ও অসন্তোষ জমা হয়। অবহেলা ছোট ও প্রান্তিক গোষ্ঠীকে কোণঠাসা করে, বিচ্ছিন্ন করে। এসব ক্রমে বড় সমস্যার সূত্রপাত করে এবং জনজীবনের জন্য অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি বাড়ে।

বোঝাপড়া, সমমর্মিতা– সমাজের বিভিন্ন অংশগুলোর পরস্পরকে জানা ও বোঝা সম্মিলিত জনজীবনের ভালো থাকার জন্য জরুরি। সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর ধারা থেকে যা কিছু ভিন্ন, তার সম্পর্কে ভুল-বোঝাবুঝি বা অবজ্ঞার সূত্রপাত হয় না-জানা বা ভ্রান্ত ধারণা থেকে। মানুষের বড় পরিচয় কিন্তু সমমর্মিতা। সেখানে পৌঁছানোর প্রথম সোপান, অন্যকে যথাযথ জানা ও চেনা। সাংবাদিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের জীবনের কথা যথাযথ জানিয়ে সেই সমমর্মিতা ও সংহতির ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেন।

২

অস্তিত্ব, সমস্যা, বঞ্চনাঃ জানা এবং জানানোর কেন্দ্রবিন্দু

সরকার ১৯৯১ সালের জনশুমারিতে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করেছিল। সে হিসাব গুছিয়ে নিলে এমন জাতিসত্তার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬টি। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব, মধ্যভাগ, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বের কয়েকটি অঞ্চলে তাদের বেশি সংখ্যায় দেখা যায়। পাহাড়, বন, গড়াঞ্চলে যেমন, তেমনি সমতলেও ঘনবসতি এলাকা আছে। এ ছাড়া, জনশুমারি বলছে, ৬৪ জেলার প্রতিটিতেই কোনো না কোনো ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বাস আছে।

২০১১ সালের জনশুমারিতে সংখ্যাটি ২৭। ২০২২ সালের জনশুমারিতে ৫০টি জাতিসত্তার হিসাব করা হয়েছে। গণনায় 'অন্যান্য'র ঘরেও হিসাব মিলছে। জাতীয় আদিবাসী ফোরাম বলছে, সংখ্যাটি অন্তত ৫০ (দেখুন তথ্যকণিকা 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা')।

বাংলাদেশের এসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের একটি প্রধান দাবি, তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় এবং অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও সুরক্ষা। এ দাবি উঠছে গুরুতর সমস্যা ও বঞ্চনার প্রেক্ষাপটে। আমরা দেখেছি, এই একই প্রেক্ষাপটে এদের প্রতি সংবাদমাধ্যমের বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজনীয়তা আসছে। একই কারণে, নিজেদের স্বতন্ত্র ভাষা বা সংস্কৃতি হারিয়ে বাঙালি সমাজের প্রান্তে মিশে যাওয়া সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীগুলোও বিবেচনা দাবি করে।

বাংলাদেশের ইতিহাসচর্চার সাধারণ ধারায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালি জাতিকে প্রধান করে দেখা হয়। রাষ্ট্র ও সমাজের মানসেও এ প্রবণতা প্রবল। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীদের বঞ্চনা, বঞ্চনার অনুভূতি ও ক্ষোভের শিকড় তাই একেবারে মৌলিক জায়গায়। এদের কী নামে ডাকা হবে, সে বিতর্ক দেখলে বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়।

'আদিবাসী' বনাম উপজাতি

- ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযেজিত ২৩ক ধারায় তাদের উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নৃবিজ্ঞানে 'উপজাতি' ও 'উপজাতিগোষ্ঠী' (ট্রাইব বা ট্রাইবাল গ্রুপ) বলতে রাষ্ট্রের উদ্ভবের আগেকার জ্ঞাতিসম্পর্কভিত্তিক বিশেষ সমাজকে বোঝায়। এখন যেহেতু সব জনগোষ্ঠীই কোনো না কোনো রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত, তাই 'উপজাতি' শব্দটি আর খাটে না। এর নেতিবাচক অবজ্ঞাসূচক ব্যঞ্জনাও আছে। শব্দটির মধ্যে মিশে আছে 'আদিম', 'অসভ্য', 'বর্বর'– এসব ধারণা। তা ছাড়া, এ নামে ডাকলে জাতির চেয়ে নিচে অবস্থান দেওয়া হয়।
- নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি-সমাজব্যবস্থাসহ এদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জাতিগত পরিচয় বা ঐতিহ্য আছে। অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানী তাই এদের নৃগোষ্ঠী, জাতিসম্প্রদায়, জাতিগোষ্ঠী বা জাতিসত্তা (এথনিক কমিউনিটি বা এথনিক গ্রুপ) হিসেবে চিহ্নিত করছেন। নৃবিজ্ঞানীরা আদিবাসী শব্দটিও ব্যবহার করছেন। সংখ্যালঘুত্বের বিবেচনায় 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' বা 'এথনিক মাইনরিটি' শব্দটি প্রচলিত আছে; তবে মনে রাখা ভালো, এদের সমস্যা বা বঞ্চনা শুধু সংখ্যায় কম হওয়ার জন্যই নয়।
- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকাংশ মানুষজন পছন্দ করছেন 'আদিবাসী' পরিচিতি। কিন্তু বাংলাদেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা প্রসঙ্গে বিভিন্ন আলোচনা এই 'আদিবাসী' বলা ও না বলার প্রশ্নে এসে তর্ক-বিতর্কের স্রোতে হারিয়ে যেতে বসে। প্রশ্ন ওঠে, আদি বাসিন্দা কারা? বাঙালিরাও এ ভূখণ্ডের দীর্ঘকালের বাসিন্দা। কোন জনগোষ্ঠী আগে এসেছে আর কে পরে অভিবাসী (সাঁওতাল বা চা-শ্রমিকেরা), তা নিয়ে গোল বাধে; অনেক ক্ষেত্রে তা প্রমাণ করা কঠিন হয়। তবে এ ব্যাপারটি সতর্কতার সঙ্গে সঙ্গে সংবেদনশীলভাবে গভীরে তলিয়ে বোঝা দরকার।
    - ✓ বন-পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র জাতগোষ্ঠীগুলোই প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল। সমতলে এবং অন্যত্র কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে হয়তো বাঙালিরা আগে গিয়েছিল। কালের বিচারে বাংলাদেশ তথা অনেক রাষ্ট্রেরই জন্ম সেদিনের ঘটনামাত্র। আর অঞ্চলে অঞ্চলে বা পুরো পৃথিবীতেই ইতিহাসের গোড়া থেকে মানুষের অভিবাসন-বসতি স্থাপন একটি সদা চলমান

প্রক্রিয়া। কে আগে বা কে পরে, সে বিতর্ক এক অর্থে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়; কিন্তু প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ও সুরক্ষার প্রসঙ্গে।

- ✓ আন্তর্জাতিকভাবে 'আদিবাসী' বা 'ইনডিজেনাস পিপল' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে নিকট-অতীতের কয়েক শতকের ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো অঞ্চলে ঔপনিবেশিকতার ফলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন-নির্মূল হতে বসা আদি বাসিন্দাদের বোঝাতে শব্দটি এসেছে। এ পরিচিতি এদের ঐতিহাসিক বঞ্চনা ও শোষণের প্রতিকারে আইনগত অধিকার নিশ্চিত করার উদ্যোগের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত।
- ✓ বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো এই একই প্রেক্ষাপটের রকমফেরের ভুক্তভোগী। এ ভূখণ্ডে ঔপনিবেশিক শাসনের সময় এরা প্রান্তিক অবস্থানেই ছিল। আধুনিক রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী ধারণাও কিন্তু সব জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের পরিচয় দেয় না। সুতরাং এসব প্রান্তিক গোষ্ঠী আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'আদিবাসী' ধারণায় অন্তর্ভুক্তি দাবি করে।
- ✓ রাষ্ট্রসহ সংখ্যাগুরুর চাপে ক্ষুদ্র জাতিসত্তারা অস্তিত্বের সংকট বা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। তারা যখন নিজেদের 'আদিবাসী' বলে, তার মধ্যে মিশে থাকে অস্তিত্ব আর অধিকারের দাবি– নিজেদের স্বাতন্ত্র্য এবং নাগরিকত্বের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার আশা ও দাবি।
- ✓ একসময় 'আদিবাসী' শব্দটিরও একটি নেতিবাচক ব্যঞ্জনা ছিল 'আদিম' অর্থে। এখন সেটা কেটে গেছে বলে মনে হয়। তবে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কেউ কেউ 'আদিবাসী' নামটি পছন্দ করেন না; তাঁরা 'উপজাতি' ও 'আদিবাসী'– এ দুই ভাগে দেখার পক্ষপাতী। এঁদের সংখ্যা অবশ্য খুব কম।

- **সাংবাদিক কী বলবেন:** সংবাদমাধ্যম কর্তৃপক্ষের যদি আপত্তি না থাকে, 'আদিবাসী' শব্দটির ব্যবহার ভুল হবে না, বরং অনেক ভুল-বোঝার অবসান ঘটাবে। আর সংবাদমাধ্যমের যদি আপত্তি থাকে, 'উপজাতি' না বলে বরং 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' গ্রহণযোগ্য বিকল্প হবে। 'উপজাতি' বললে ওই জনগোষ্ঠীর অনেকেই মনে কষ্ট পান, এটা সম্পাদকদের বুঝিয়ে বলা প্রতিবেদকের দায়িত্ব। গণমাধ্যমের সঙ্গে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর দূরত্ব দূর করার জন্য এটা একটা ছোট কিন্তু বড় প্রসঙ্গ। এদিকে কোনো ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিনিধি যদি 'আদিবাসী' পরিচয়ে আপত্তি করেন, আপনি 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' বলবেন– 'উপজাতি' নয়।

মোটাদাগে সমস্যা-বঞ্চনা ও জরুরি বিষয়াবলি

আদিবাসীদের সমস্যা ও তাদের জন্য জরুরি বিষয়গুলোর দীর্ঘ ইতিহাস আছে। সমসাময়িক ঘটনাবলির তাৎপর্য বুঝতে হয় সেই প্রেক্ষাপটে। মোটাদাগে এমন প্রধান কয়েকটি সমস্যা ও বিষয়:

- ✓ *প্রথাগতসহ ভূমির অধিকার বা বন-পাহাড় ব্যবহারের অধিকারের অস্বীকৃতি, হরণ, লঙ্ঘন বা বঞ্চনা।* এটা শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে, পরে ব্যাপক হয়েছে। কখনো রাষ্ট্রীয় নীতি-সিদ্ধান্ত, কখনো অ-আদিবাসী অভিবাসন এ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে।
- ✓ *মানবসম্পদ উন্নয়ন বা বিকাশে সমস্যা, সুযোগের অভাব; জীবিকা বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার সীমিত সুযোগ; শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবার সুযোগে ঘাটতি।* আদিতে প্রান্তিক কৃষিজীবী এসব মানুষ সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী ও বাজার-অর্থনীতির প্রবেশের চাপে ক্রমেই আরও প্রান্তিক অবস্থানে চলে গেছে। সব জাতিসত্তার মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ সমান হয়নি,

সার্বিকভাবেও শ্রেণিটি ছোট। দারিদ্র্য এবং নিঃস্বকরণ বেশির ভাগের সাধারণ সমস্যা। জুমচাষের ওপর বিধিনিষেধ এবং নিজেদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাহাড় অঞ্চলে অনেক মানুষের জীবিকাকে সংকটে ফেলেছে, কার্যকর বিকল্প মেলেনি। দুর্গম অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলোর সুযোগের অভাব আরও বেশি।

- ✓ *তাদের বসবাসের এলাকায় ইকোপার্ক, বাণিজ্যিক বনায়ন, গ্যাস-কয়লা আহরণ বা শক্তি উৎপাদন প্রকল্পসহ বিভিন্ন 'উন্নয়ন' প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব।* ১৯৬০-এর দশকে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প যেমন রাঙামাটি জেলায় আদিবাসীদের সেরা আবাদি জমির ৪০ শতাংশ হ্রদের পানিতে ডুবিয়ে দেয়। এর জেরে সমস্যা আজও গড়াচ্ছে।

- ✓ *সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বা সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর ক্ষমতাবানদের স্বার্থতাড়িত সংঘাত-সহিংসতা বা নিপীড়ন; প্রশাসন/কর্তৃপক্ষের হাতে বা যোগসাজশে মানবাধিকার লঙ্ঘন।* বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় এর চিত্র প্রকট। ব্যক্তি বা জাতিগোষ্ঠী ধরে ঘটনার নজির অন্যান্য জায়গাতেও আছে।

- ✓ *রাষ্ট্রের তরফ থেকে নানা মাত্রায় নিয়ন্ত্রণের চাপ।* সরকারি বিভিন্ন নীতি নিয়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অনেক ক্ষোভ আছে। অনেকে মনে করেন, এগুলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দমনমূলক এবং সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর তুলনায় তাদের প্রতি বৈষম্য করার চেষ্টা। জনশুমারিতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের সংখ্যা কম গণনা করার বড় অভিযোগ ওঠে।

- ✓ *সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রথা-রীতি-ঐতিহ্যের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া; ভাষা হারিয়ে যাওয়ার হুমকি।* সামাজিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, অর্থনীতি, প্রশাসন, যোগাযোগ ও শিক্ষার মাধ্যম ভাষা– সব দিক দিয়েই তাদের বিদ্যমান প্রবল ধারার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়েছে। কখনো এটা হয়েছে চাপে পড়ে, জোরের ওপর; কখনো বাঙালিদের সঙ্গে পরস্পরনির্ভর মেলামেশা-লেনদেনের প্রক্রিয়ায়। অনেকখানেই তাদের নিজেদের প্রথাগত রীতি-পদ্ধতি টানাপোড়েনের মধ্যে আছে। অনেক দাবিদাওয়ার পর সরকার ২০১৭ সাল থেকে আদিবাসী শিশুদের পাঁচটি মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করে। তবে শিক্ষকের অভাবসহ নানা সমস্যায় এর কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

- ✓ *ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে সাংবিধানিক সুরক্ষা ও স্বীকৃতিকে তাদের নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে জাতীয় জীবনে সম্পৃক্ত হওয়ার উপায় হিসেবে দেখছেন।* তবে তাঁরা এখনো আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাইছেন।

- ✓ *বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যে বৈষম্যের পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট।* অন্যদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তির (দেখুন 'তথ্যকণিকা') পরিপ্রেক্ষিতে আলাদা মন্ত্রণালয়সহ বিশেষ প্রশাসনিক কাঠামো ও আইন হয়েছে। সেটা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীদের মনে বঞ্চনা ও ক্ষোভ তৈরি করতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধা লাভেও অপেক্ষাকৃত বড় সুযোগসম্পন্ন জাতিগোষ্ঠীদের তুলনায় ক্ষুদ্রতর জাতিরা পিছিয়ে পড়ে। সাক্ষরতা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা– সব দিক থেকে তাদের অবস্থার মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য আছে।

- ✓ *জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের জীবিকা, বাসস্থান ও সার্বিক জীবনধারায় অনেক পরিবর্তন প্রকটতর হচ্ছে।* জলবায়ু পরিবর্তন তাদের জন্য শুধু পরিবেশগত পরিবর্তন নয়; এটি তাদের জীবিকা, প্রাকৃতিক সম্পদ, সামাজিক জীবন, ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক চর্চার জন্যও একধরনের হুমকি। তাদের কৃষি ও প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল জীবিকায় এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। যেমন, নওগাঁ অঞ্চলে খরা প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় ফসলের জমি কমে যাচ্ছে এবং ব্যাপকভাবে আমবাগান হচ্ছে। সেখান সাঁওতালদের প্রধান পেশা ছিল কৃষি। তারা এখন কাজ পাচ্ছে না। আবার তাদের মধ্যে কাজের খোঁজে অন্যত্র চলে যাওয়া বা মাইগ্রেট করার প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে না।
- ✓ *নতুন পেশা ও বাধ্যবাধকতা।* ২০২২ সালে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ক্রিশ্চিয়ান এইডের পরিচালিত Occupational hardships of minority communities in Bangladesh একটি গবেষণায় দেখা গেছে,
    - উত্তরাঞ্চলে খরা প্রবণতার কারণে কাজ কমে যাওয়ায় কৃষিনির্ভর ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষেরা ভ্যান চালানো এবং অন্যান্য অকৃষি শ্রমে নিযুক্ত হচ্ছেন।
    - তরুণদের মধ্যে প্রাচীন পেশা ধরে রাখার কোনো আগ্রহ নেই, লেখাপড়ায় আগ্রহ অনেক বেশি। তরুণেরা সরকারি কাজে যোগ দিতে চান।
    - প্লাস্টিকের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় বাঁশ-বেতের কাজের ওপর নির্ভরশীল মানুষেরা কাজহীন হয়ে পড়ছে।
    - পাহাড়ে কাজু ও কফি এবং অন্যান্য ফল চাষ থেকে আয়ের সুযোগ বাড়ছে।

৩

ক্ষুদ্র জাতিসত্তার খবরাখবর প্রতিফলনে ঘাটতি

একটি বড় হেঁয়ালি: ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য জরুরি বিষয়গুলো এবং তাদের খবরাখবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা সাংবাদিকতার নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু সংবাদমাধ্যমে এসব বিষয় এবং খবরাখবর উঠে আসায় ঘাটতি আছে। প্রতিফলনের এ ঘাটতির ধরন ও কারণ বোঝা দরকার।

ঘাটতির ধরন: সংবাদমাধ্যমে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিফলনের ঘাটতি দ্বিমুখী।

১. **প্রতিফলনই কম:** সংবাদমাধ্যমে সাধারণভাবে জায়গা বরাদ্দ কম। কখনো কখনো বড় কোনো ঘটনা বা উপলক্ষ থাকলে কিছু মাধ্যমে বিক্ষিপ্তভাবে বড় জায়গা দেওয়া হতে পারে। তবে সেটা কোনো নিয়মিত প্রবণতা নয়। তা ছাড়া, প্রতিবেদনের বিষয়গুলো দেখলে প্রতিফলনের ধরনে ঘাটতির বিষয়টি সামনে

চলে আসে। যেমন, প্রথম সারির ১১টি জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকার ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সংখ্যাগুলোর আধেয় বিশ্লেষণ করে এমআরডিআই আদিবাসী-সংক্রান্ত ১৯৯টি খবর পেয়েছে। এর বড় অংশটি ছিল সংস্কৃতিবিষয়ক এবং প্রকৃতি-পরিবেশের খবর ও ছবি।

২. **প্রতিফলনের ধরন ন্যায্য নয়:** জরুরি বড় বিষয়গুলো যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সঠিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরতে সংবাদমাধ্যম সচেষ্ট হয় না। ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের সম্পর্কে খবরাখবরের বড় অংশটি আসে সংবাদমাধ্যমের আঞ্চলিক প্রতিনিধি বা প্রতিবেদকদের কাছ থেকে। এমআরডিআইয়ের জরিপভুক্ত দৈনিকগুলোর সিদ্ধান্তগ্রহীতা সম্পাদক পর্যায়ের সংবাদকর্মী বা গেটকিপারদের অধিকাংশই বলেছেন, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা প্রসঙ্গে তাঁরা তাঁদের জেলা-উপজেলা প্রতিনিধিদের দুই ধরনের খবর করতে সবচেয়ে বেশি বিশেষ নির্দেশনা দেন। এগুলো হচ্ছে:

   - ✓ রাজনৈতিকসহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বড় সংঘাত-সংঘর্ষ, সহিংসতা বা অপরাধ, যেটা দিনের খবর হিসেবেই গুরুত্ব পায়
   - ✓ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-উৎসবের খবর

সংবাদমাধ্যমে এ ছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে আসে দিনের বড় কোনো দুর্ঘটনা বা অনুষ্ঠানের খবর, আদিবাসী দিবসে গৎবাঁধা প্রতিবেদন বা আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে ফিচার। এ ছাড়া, হয়তো বিশেষ দিবস উপলক্ষে হাতে গোনা কিছু পত্রিকায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তার স্বার্থ-অধিকার নিয়ে সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় দেখা যায়।

ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের বিষয়ে যে খবরগুলো আসে, সেগুলোতেও ঘাটতি থাকে:

- ✓ খবরগুলো প্রায়ই হয় ওপরভাসা ধারাবিবরণী ধাঁচের; অন্তর্দৃষ্টি বা দিকনির্দেশনা কম মেলে; সঠিক প্রেক্ষাপট মেলে না। কখনো ভুল তথ্য থাকে। এভাবে সংঘাত-সংঘর্ষের মতো জরুরি বিষয় প্রকাশিত হলেও অনেক সময় গুরুতর ঘাটতি থাকে।
- ✓ স্পর্শকাতর ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুখর খবর ঢাকাচাপা দেওয়া বা বিকৃত করার মতো নেতিবাচক প্রতিফলন দেখা যায়।
- ✓ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবনধারা, জীবিকা, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ছাঁচে-ঢালা (স্টেরিওটাইপ/প্রেজুডিস করা) ঢালাও কিছু অযৌক্তিক ধারণা বা সুর উঠে আসে। যেমন, আদিবাসীরা সহজ সরল, বোকাসোকা; তারা অনগ্রসর, 'অশিক্ষিত'; তারা সর্বভুক; আদিবাসীদের রীতিনীতি 'অ-সভ্য'; তাদের জীবনযাপন 'আদিম'...।
- ✓ কিছু কিছু সংবাদমাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঢালাও নেতিবাচক খবর দেখা যায়। যেমন, আদিবাসীরা বনের জমি দখল করছে।
- ✓ উল্টো দিকে ঢালাও কিছু 'ইতিবাচক' প্রতিফলনও দেখা যায়। যেমন, আদিবাসীরা যা-কিছুই করে, তা সব ভালো। কখনো আবার ক্ষুদ্র জাতিসত্তার পক্ষে কোনো কিছু বাড়িয়ে বলা হতে পারে। সেটা সমান ক্ষতিকর; কারণ, বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষতি হয়।

ঘাটতির কারণ: সংবাদমাধ্যমে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিফলনের এসব ঘাটতি দূর করতে হলে এর কারণগুলো বুঝতে হবে। এর কিছু কারণ নিহিত আছে সংবাদমাধ্যমের প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রে, মালিক-সম্পাদকীয় নীতিতে এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য জরুরি বিষয়গুলোর অন্তর্গত ঝুঁকির মধ্যে:

- **গণমাধ্যম, গণপাঠক:** অধিকাংশ দৈনিক পত্রিকা বা গণমাধ্যম বিজ্ঞাপনের আয়ের ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞাপনদাতা খোঁজেন পাঠক-কাটতি। গণমাধ্যমও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের গড়পড়তা চাহিদা ধারণা করে নিশ্চিত সাধারণ আগ্রহের বিষয়গুলো প্রাধান্য দেয়।
  - ✓ এভাবে খবরের প্রচলিত ধারণায় রাজনীতি আর বড় ব্যবসার খবর গুরুত্ব পায়, মানুষ গৌণ হয়ে যায়। তা ছাড়া এ দেশে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর মানুষেরই সাধারণ সমস্যা অনেক। সংবাদমাধ্যমের সীমিত পরিসরে সেগুলো অগ্রাধিকার পায়।
  - ✓ ফলে সম্পাদকীয় সচেতন দৃঢ় নীতি-সিদ্ধান্ত না থাকলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মতো বিশেষ কোনো গোষ্ঠীকে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে ওঠে না। প্রতিফলনে একই ধারার কমবেশি ঘাটতি যেমন দেখি সার্বিকভাবে নারী, প্রতিবন্ধী বা প্রান্তিক ও সংখ্যালঘু যেকোনো গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে।
  - ✓ এদিকে সংখ্যাগুরু গড়পড়তা জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মতো 'ভিন্ন' সম্পর্কে নেতিবাচক ছাঁচে-ঢালা ধারণা বা স্টেরিওটাইপ কাজ করে। 'আমরা' ও 'তারা'—এভাবে বিভাজন থাকে। স্বার্থের দ্বন্দ্বও চলে আসে। পাঠক-কাটতির কথা মাথায় রেখে গণমাধ্যম নিরাপদ মধ্যপন্থা নেয়; সমাজের প্রবলতর মূল্যবোধ, স্বার্থচিন্তা বা ধারণায় তারা নাড়া দিতে চায় না।

- **ক্ষমতাশালীদের সঙ্গে টক্কর:** বৈষম্যের শিকার ও সুযোগবঞ্চিত গোষ্ঠীর সমস্যা-সংকট জানাতে গেলে প্রায়ই তা সরকারসহ বিভিন্ন ক্ষমতাকেন্দ্রের বিরুদ্ধে যায়। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বড় যেসব সমস্যা আগে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে খেটে যায়।
  - ✓ রাষ্ট্র বা সরকারের সঙ্গে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার স্বার্থ-অধিকারের বিষয়গুলো নিয়ে জোরালো দ্বন্দ্ব যে আছে, তার আভাস পাই জনশুমারিতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংখ্যা কম দেখানোর অভিযোগ থেকে এবং 'আদিবাসী' বনাম 'উপজাতীয়' নামের প্রশ্নে।
  - ✓ এসব স্বার্থ-অধিকারের বিষয়ে খবর করতে গেলে রুষ্ট প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় স্থানীয় দখলকামী-ক্ষমতাবান ও মাস্তান থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপনদাতা, পুলিশ-প্রশাসন, সামরিক বাহিনীসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অথবা উন্নয়ন প্রকল্প।

সুতরাং সংবাদমাধ্যম কর্তৃপক্ষ পিছিয়ে যেতে পারে। সম্পাদকীয় নীতি ইতিবাচক থাকলেও হিসাবনিকাশ করে চলার নজির আছে। কখনো নিজেদের স্বার্থের প্রশ্ন চলে আসে।

- **নীতি, স্বার্থ, রাজনীতি:** সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও বিশ্বাস-মূল্যবোধ এবং রাজনীতির কারণে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার স্বার্থ-অধিকারের ব্যাপারে সম্পাদকীয় নীতি নেতিবাচক হতে পারে। সংবাদ প্রতিষ্ঠানের মালিকের স্বার্থ এমন প্রভাব ফেলতে পারে। সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু ধর্মকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের প্রভাবও পড়তে পারে। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরা মূলত বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, হিন্দু বা আদি-ধর্ম অনুসারী।
  - ✓ ক্ষমতাশালীর সঙ্গে টক্করের বিবেচনা এবং নীতি-স্বার্থ-রাজনীতির দ্বন্দ্ব– দুটোই বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতি সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের খবরের ওপর। সংবাদমাধ্যমের নীতি নেতিবাচক হলে এসব খবর চাপা দেওয়া থেকে শুরু করে কমিয়ে বা পক্ষ টেনে খবরকে রঞ্জিত বা প্রভাবিত করার প্রবণতা থাকে। সংবাদমাধ্যমভেদে পার্বত্য চট্টগ্রামের

বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপনে তারতম্য এর বড় উদাহরণ। সহিংসতার খবরে সাবধানতা নিতে গিয়েও এমন হতে পারে।

✓ নীতি ইতিবাচক হলেও নানা বিবেচনায় কখনো রাখঢাক আসে।

নীতি প্রয়োগে অবহেলা: মালিকের বা সম্পাদকীয় নীতি ইতিবাচক হলেও প্রয়োগে তারতম্য হতে পারে। রোজকার সিদ্ধান্ত যে সংবাদকর্মীরা নেন, তাঁদের নিজস্ব নেতিবাচক মনোভাব থাকতে পারে। অথবা নিছক হেলাফেলা করা হতে পারে। এর প্রভাব পড়ে প্রতিবেদককে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা-সমর্থন দেওয়ার ওপর।

ওপরে বলা কারণগুলো ব্যক্তি-সাংবাদিকের কাজ ও চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে। ঘাটতির কারণ হিসেবে ব্যক্তি-সাংবাদিকের কিছু সীমাবদ্ধতার কথাও চলে আসে:

- **মনোভাব–** অধিকাংশ প্রতিবেদক এবং খবরের সিদ্ধান্তগ্রহীতারা সংখ্যাগুরু জাতিগোষ্ঠীর সদস্য। নিজের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে 'ভিন্ন' সম্পর্কে নেতিবাচক বা বদ্ধমূল ধারণা। হয়তো নিজের অগোচরে কাজে প্রভাব পড়ে।

- **ভয়, চাপ, প্রলোভন–** নিজের ঝুঁকির বাস্তব ভয়, পুলিশ-সেনাবাহিনী-প্রশাসনসহ প্রতিপক্ষের চাপ এবং প্রলোভনের টোপ থাকে। স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণ বা সেলফ-সেন্সরশিপ চলে আসে।

- **তথ্যের ঘাটতি–** ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও তাদের জন্য জরুরি বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা-বোঝায় ঘাটতি থাকে। ভিত্তিজ্ঞান না থাকায় অনেক বিষয় যেমন নজরে পড়ে না, তেমনি প্রতিবেদন করতেও অনীহা আসে। অনেক সময় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের অভাব থাকে, তাদের মধ্যে ভালো সূত্র থাকে না। স্পর্শকাতর বিষয়ে কর্তৃপক্ষ তথা ক্ষমতাকেন্দ্র তথ্য দেয় না, খোঁজাখুঁজিতে বাধাও দেয়। পুলিশ-গোয়েন্দা, সেনা কর্তৃপক্ষ খবর খাওয়াতে চায়। ভুক্তভোগীসহ সাধারণ মানুষ সংগত কারণেই মুখ খুলতে ভয় পায়।

- **প্রতিবেদকের উদ্যম-উদ্যোগে ঘাটতি–** ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের সম্পর্কে খবরের খোঁজ পেতে এবং ভালো প্রতিবেদন করতে হলে গভীরে তলিয়ে কাজ করতে হয়। এ কাজ সময় ও কষ্টসাপেক্ষ। উদ্যোগী হয়ে গভীরে গিয়ে খবর না খোঁজার প্রবণতা থাকে।

- **প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার অভাব–** সংবাদমাধ্যম কর্তৃপক্ষের নীতি নেতিবাচক হোক বা ইতিবাচক, প্রতিবেদককে এসব খবর করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে চাওয়া হয় না। অনেক সময় কোনো ঘটনাস্থলে যাওয়া কঠিন ও খরচসাপেক্ষ। প্রতিষ্ঠান সব ক্ষেত্রে ঘোরাঘুরির খরচ দিতে চায় না। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিষ্ঠান নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে চায় না। প্রতিষ্ঠানের জোরালো সহযোগিতা ও সমর্থন না থাকলে রিপোর্টার ঝুঁকি নিতে পারেন না।

করণীয় ও উপায় খোঁজা: প্রশ্ন হচ্ছে, সংবাদমাধ্যমে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ন্যায্য প্রতিফলন নিশ্চিত করতে ব্যক্তি-সাংবাদিক কী করতে পারেন। প্রথম সোপান, কঠিন এ কাজ করতে চাওয়া এবং বাধা বা সমস্যাগুলো দূর করার উপায় ভাবা। নিজের সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করুন, তলিয়ে ভাবুন, কাটিয়ে উঠুন। সর্বোচ্চ সাধ্যমতো সবটুকু চেষ্টা করবেন, এই লক্ষ্যে একাগ্র থাকুন। আন্তরিক সদিচ্ছা থাকলে পরিস্থিতিভেদে করণীয় ভেবে বের করতে পারবেন। সাংবাদিকতা পেশার দাবি, নীতি-নৈতিকতা এবং বনিয়াদি করণীয়গুলো পথ দেখাবে।

৪

পথের খোঁজ ভালো সাংবাদিকতায়

সংবাদমাধ্যমে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার খবরাখবর প্রতিফলনের ঘাটতি দূর করা মানে কিন্তু ভালো ও নৈতিক সাংবাদিকতার চর্চা করা। অর্থাৎ, ভালো প্রতিবেদন করা। মানবাধিকারসহ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য জরুরি বিষয়গুলো এভাবে সাংবাদিকতার মূল করণীয়র মধ্যে চলে আসে।

প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যাসহ প্রতিফলনে ঘাটতির কারণগুলো ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু রিপোর্টারের নিজস্ব একটা দায় এবং তাগিদ থাকে।

- নিজের নিরাপত্তা যথাসম্ভব নিশ্চিত করা প্রথম কথা। তারপরও কিছু ঝুঁকি নিতে হয়। চাপ-প্রলোভন জয় করতে হয়। পত্রিকা-কর্তৃপক্ষকে বোঝানোর চেষ্টা করতে হয়। মন খোলা রেখে জানা ও বোঝা বাড়াতে হয়। ঘটনা, মানুষ, প্রাণ-প্রকৃতির প্রতি সংবেদনশীল থাকতে হয়। এবং উদ্যমী হয়ে ভালো প্রতিবেদন করতে হয়।
- সাংবাদিকতার লক্ষ্য মানুষের কাজে লাগা। নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করলে সাংবাদিকতা ভালো ফল আনবে। এই লক্ষ্যে বিশ্বাস করুন এবং মানুষের ওপরে আস্থা রাখুন।
- সংবাদমাধ্যমের সবচেয়ে বড় শক্তি পাঠক বা শ্রোতা-দর্শকের সমর্থন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের গড়পড়তা আগ্রহের গৎবাঁধা ধারণাই শেষ কথা নয়। খবরের গ্রাহকেরা সংবেদনশীল। তবে তাদের আগ্রহ ও যুক্তির কাছে সাড়া জাগাতে পারতে হয়; তাদের সজাগ করতে হয়। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের খবরাখবর যদি ভালো সাংবাদিকতার চাহিদাগুলো পূরণ করে ভালোভাবে উপস্থাপিত হয়, অনেক মানুষই তাতে আগ্রহী হবে। খবরের যথেষ্টসংখ্যক গ্রাহক যা চাইবে বা গ্রহণ করবে, সংবাদমাধ্যমও তা চাইতে বাধ্য হবে।
- যার সমস্যা, যার কথা, তার তাগিদ সবচেয়ে বেশি। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্য থেকে যিনি সাংবাদিকতায় আসবেন, তাঁর আন্তরিকতা ও চেষ্টার তাই একটি স্বতন্ত্র মাত্রা থাকবে। কিন্তু তাঁকে খুব সতর্ক থাকতে হবে, তিনি যেন নিজেকে 'আদিবাসী সাংবাদিক' জাতীয় কোনো খোপে আটকে না ফেলেন। ভালো সাংবাদিকতা এবং শুধু ভালো সাংবাদিকতার প্রতি একনিষ্ঠ থাকলেই তিনি তাঁর অন্তর্গত তাগিদ সবচেয়ে ভালোভাবে পূরণ করতে পারবেন।

ভালো সাংবাদিকতা, ভালো প্রতিবেদন

- ঘটনা ঘটার জন্য বসে থাকবেন না। গভীরে তলিয়ে দেখে প্রতিবেদনের বিষয় ভাবুন।
- উপরিতলের নিচের খবর খুঁজতেই হবে। অনেক ঘোরাঘুরিও করতে হবে। তথ্য পাওয়া কঠিন কিন্তু হাল ছাড়া চলবে না। ঘটনার কারণ-ফলাফল-তাৎপর্য জানতে হবে এবং সেগুলো তথ্য-প্রমাণসহ মানবজমিনে দেখাতে, জানাতে ও বোঝাতে হবে।

- নিজে অনুসন্ধানের পরিকল্পনা করুন। ছোটখাটো জরিপ বা গবেষণাও করে ফেলতে পারেন।
- নজর রাখুন, কোথায় ক্ষোভ-অসন্তোষ জমছে। প্রতিবেদক যদি সজাগ ও ওয়াকিবহাল থাকেন, তবে তিনি ঘটনা-প্রবণতার ধারা সঠিকভাবে তুলে ধরে অনেক সংঘাত-সংঘর্ষ, সহিংসতা বা মানবিক বিপর্যয়ের পূর্বাভাস দিতে পারেন।
- ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীদের সম্পর্কে মানুষ অনেক কিছুই জানে না বা ভুল জানে। সঠিক ও সত্য তথ্য দিয়ে সেগুলো দূর করা জরুরি।
- ইতিবাচক ঘটনা বা বিষয়ের খবর করতে ভুলে যাবেন না। সেগুলো গ্রাহকের মনোযোগ পায়, সম্পৃক্ততা বাড়ায়।
- শুধু লেখা নয়, ইনফোগ্রাফিকস, ছবি-ভিডিওসহ দৃশ্য উপকরণ ব্যবহার করুন। পডকাস্টই বা নয় কেন?

প্রস্তুতিপর্ব

প্রস্তুতি না থাকলে যেকোনো বিষয়েই ভালো প্রতিবেদন করা কঠিন। এ ক্ষেত্রে প্রস্তুতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক:

- **মন তৈরি করা:** ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সম্পর্কে ভালো প্রতিবেদন করার জন্য নিজের মনের প্রস্তুতি দরকার। দুটি মূল কথা:
  - ✓ নিজের ছাঁচে-ঢালা ধারণাগুলো বা স্টেরিওটাইপ/প্রেজুডিস সম্পর্কে সজাগ ও সাবধান থাকা চাই। দেখা এবং লেখায় যেন এর প্রভাব না পড়ে।
  - ✓ অন্যদিকে, সংযম অত্যাবশ্যক। সুযোগবঞ্চিত বা অন্যায়-অত্যাচারের শিকার গোষ্ঠীর প্রতি সংবেদনশীলতা বা সেনসিটিভিটি ও প্রয়োজনীয় সমমর্মিতা থাকবে, কিন্তু সেটা অযৌক্তিক বা প্রচারণাধর্মী যেন না হয়। আবেগের বশে 'আহা বেচারা' দৃষ্টিভঙ্গিও বাঞ্ছনীয় নয়।
- **ভিত্তিজ্ঞান:** ভালো ভিত্তিজ্ঞান বা ব্যাকগ্রাউন্ড তথ্য জানা থাকা দরকার। এ জ্ঞান নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো, তাদের সমস্যা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণ ধারণা রাখুন। ভূমি, বন, প্রকৃতি-পরিবেশ-প্রতিবেশ ও আদিবাসী এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্পগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকুন। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইন, বিধিবিধান, তাদের অধিকারের স্বীকৃতি এবং বড় ঘটনাগুলো জানুন।
  - ✓ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সম্পর্কে গবেষণা ও বইপত্রের ঘাটতি আছে। অতীতের তথ্য জানার জন্য সরকারের জেলা গেজেটিয়ারগুলো দেখতে পারেন। বইপত্র থেকে তথ্য নিতে গেলে দেখবেন, সেগুলো নৃবিজ্ঞানীদের লেখা কি না এবং যথাযথ গবেষণা কি না। শখের লেখকের লেখায় অনেক ভুল থাকতে পারে। বাংলাপিডিয়ার কিছু তথ্যও ভুল, বিভ্রান্তিকর ও আপত্তিকর বলে নজির এবং জোরালো অভিযোগ আছে।
  - ✓ ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের নিজস্ব সংগঠন ও সংস্থার কাছ থেকে তথ্য নেবেন, তবে সেগুলো অন্যান্য সূত্রেও যাচাই করবেন। বিভিন্ন এনজিওর বেশ কিছু প্রকাশনা আছে। তার কিছুতে ছাঁকা তথ্য থাকতে পারে। তবে আদিবাসী প্রশ্নে সাধারণভাবে এমন যেকোনো সংস্থার অবস্থান বিচার করে দেখবেন এবং অবশ্যই পাল্টাপাল্টি যাচাই করবেন।

- ✓ এডিবি, ইউএনডিপি, বিশ্বব্যাংকসহ দাতাগোষ্ঠী বা অন্য এনজিওগুলো ক্ষুদ্র জাতিসত্তা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে যেসব সমীক্ষা ও প্রকল্প করেছে সেগুলোর কাগজপত্র হাতে রাখুন, হালনাগাদ করুন। সরকারি সংস্থা বা প্রশাসনের কাছ থেকে যেসব কাগজপত্র পাওয়া কঠিন, বেসরকারি সংস্থা-প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তার অনেকগুলো সহজে পাওয়া যেতে পারে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নিয়ে কাজ করা এনজিও ও কমিউনিটি বেজড অর্গানাইজেশন বা সিবিওগুলোর কাছে এমন কাগজপত্র মিলতে পারে। তাদের নেতাদের কাছেও থাকতে পারে।
- ✓ নথিপত্র, প্রকাশিত পর্যলোচনা-সমালোচনা-মূল্যায়ন দেখবেন। যথোপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের কাছে বুঝে নেবেন; মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, তাই সব কটি মত সম্পর্কে জানবেন। সরেজমিন নিজে দেখবেন।
- ✓ মাঝেমধ্যেই সরেজমিনে ঘুরে নিজের এলাকার সব কটি ছোটবড় ক্ষুদ্র জাতিসত্তার পরিস্থিতি দেখবেন। জানা-বোঝা হালনাগাদ করবেন।
- ✓ প্রাথমিক গবেষণা করে প্রতিবেদনের জন্য বিষয় খুঁজবেন, প্রতিবেদনের ধারণা সুনির্দিষ্টভাবে গুছিয়ে নেবেন। আলাদা নোটখাতা করে টুকে রাখবেন।

- **সূত্র গড়া ও রক্ষা করা:** সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে সূত্র গড়বেন। সূত্র গড়া ও রক্ষা করার ভিত্তি হচ্ছে আস্থার সম্পর্ক তৈরি করা। আস্থা পেতে হবে সব পক্ষের।
  - ✓ আপনি সত্যনিষ্ঠ এবং কারও পক্ষ হয়ে কাজ করছেন না, কিন্তু আপনার অবস্থান নৈতিক এবং সংবেদনশীল– নিজের কাজের মধ্য দিয়ে এ সুনাম ও বিশ্বাস তৈরি করবেন। সব মহলে সূত্র গড়ায় সাহায্য হবে।
  - ✓ কারও বক্তব্য বা কথার যেন বিকৃত উপস্থাপন না হয়, সে ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক থাকবেন। এমনটা হলে আপনার নিজের ঝুঁকি এবং কাজের সমস্যা বাড়বে।
  - ✓ আদিবাসীদের নেতা, তাদের বিভিন্ন সংগঠন ও মোর্চা এবং এনজিও/সিবিওর সঙ্গে যেমন যোগাযোগ রাখবেন, তেমনি সাধারণ মানুষের পর্যায়ে সূত্র রাখুন। আদিবাসী এলাকায় বসবাসকারী নানা স্তরের এবং নানা মতধারার বাঙালিদের মধ্যেও সূত্র তৈরি ও রক্ষা করুন।
  - ✓ সূত্র গড়বেন প্রশাসন, পুলিশ ও সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে, প্রাসঙ্গিক তেল-গ্যাস কোম্পানিগুলোয়, চার্চ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, উন্নয়নকর্মীদের মধ্যে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নিয়ে যাঁরা সমীক্ষা-গবেষণা করেন, তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন।
  - ✓ নানা পর্যায়ের এবং নানা পক্ষের সূত্রের সঙ্গে নিয়মিত আলাপ জারি রাখলে অনেক নতুন প্রতিবেদনের ধারণা পাবেন। এসব সূত্র তথ্য পাল্টাপাল্টি যাচাইয়ের জন্য বিশেষ কাজে আসবে।
- **ইন্টারনেট:** ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা থাকলে তার পুরো সদ্ব্যবহার করুন। নির্ভরযোগ্য খোলা অনলাইন সূত্র বা ওয়েবসাইটগুলো চিনে রাখুন, দেখুন। কিন্তু সাবধান। ইন্টারনেটের তথ্যও নিজের পর্যবেক্ষণ, নথিপত্রসহ অন্য সূত্রে পাল্টাপাল্টি যাচাই করবেন। আদিবাসী-সংক্রান্ত বা আদিবাসীদের নিয়ে কাজ করা সংস্থা-সংগঠন-আন্দোলনের ওয়েবসাইটে অধিকারবঞ্চনা, মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে আন্দোলনের ভাষ্য ভালো থাকে। কিন্তু সেটাকে এক পক্ষের বক্তব্য হিসেবেই নেবেন। এসব ওয়েবসাইটের তথ্য যাচাই করা অত্যাবশ্যক হবে।

- **তথ্য-প্রমাণ হাতে রাখা, নোট নেওয়া:** পরিষ্কার তারিখ দিয়ে খাতায় ধারাবাহিকতা রেখে নোট নেবেন। তবে সূত্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন থাকলে বা গোপনীয়তার শর্তে রাজি হয়ে কারও সঙ্গে কথা বললে তার নাম-ঠিকানা নোটখাতায় রাখবেন না। নিজে কী দেখছেন, সেটাও নোট করুন। কাগজ-প্রমাণপত্র চাইবেন এবং হাতে রাখবেন। বড় কাজের জন্য আলাদা নোটখাতা ব্যবহার করুন।

অত্যাবশ্যক বনিয়াদি করণীয়

যেকোনো প্রতিবেদন তথা সার্বিকভাবে সাংবাদিকতায় কিছু বিষয় নিশ্চিত করতে হয়। এ বনিয়াদি কাজ বা উপাদানগুলো ছাড়া ভালো প্রতিবেদন হয় না।

- ✓ **সঠিক ও সত্য তথ্য দেওয়া:** তথ্য ভুল বা মিথ্যা হলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার খবর প্রকাশে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। স্পর্শকাতর এই বিষয়ে সংবাদের আপামর গ্রাহকের আস্থা ও সমর্থন চট করে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে।
- ✓ **যাচাই করা:** জটিল ও স্পর্শকাতর বিষয়। বিতর্ক আছে, স্বার্থান্বেষী পক্ষ আছে অনেক। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিনিধিসহ যে-কেউ নিজের পক্ষ টেনে আংশিক বা ভুল তথ্য দিতে পারে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেও এটা করা হতে পারে। যা কিছুই নিজে নিশ্চিত জানেন না, তলিয়ে পাল্টাপাল্টি যাচাই বা ক্রস-চেক করে মিলিয়ে নিশ্চিত হবেন।
- ✓ **সূত্র উল্লেখ বা বরাত দেওয়া:** কোন তথ্য কার কাছ থেকে, কোন উৎস থেকে পেয়েছেন অথবা কোন বক্তব্য কার; সেটা অবশ্যই জানাতে হয়। ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সম্পর্কে খবরাখবরে যেহেতু নানা রকম ঝুঁকি ও নিরাপত্তার ভয় থাকে, ঘটনায় জড়িত মানুষজন বা তথ্যসূত্র প্রায়ই গোপনীয়তা চান। আপনাকেও তাঁর/তাঁদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাই আপনাকে বেশিসংখ্যক সূত্রের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে কোনো একটি উল্লেখ করার সুযোগ খুঁজতে হবে। তথ্যের সূত্র বা উৎস যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট করতে কৌশলী হতে হবে। নিজে সরেজমিন দেখলে যাচাই ও তথ্যসূত্র উল্লেখ নিয়ে ঝঞ্ঝাট কম হবে।
- ✓ **বস্তুনিষ্ঠতা ও সত্যনিষ্ঠতা নিশ্চিত করা:** প্রতিবেদন বা যেকোনো লেখা হতে হবে তথ্য-প্রমাণভিত্তিক, যথাযথ প্রেক্ষাপটে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা থাকতে হবে।
- ✓ **পক্ষপাতহীনতা ও ন্যায্যতা (ইমপার্শিয়ালিটি ও ফেয়ারনেস) এবং ভারসাম্য নিশ্চিত করা:** ঘটনায় অত্যাবশ্যকভাবে জড়িত সব কটি পক্ষের বক্তব্য এবং সব দিক তুলে ধরতে হবে। একপেশে হলে চলবে না। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তার বক্তব্য লাগবে। সাংবাদিকের ব্যক্তিগত পক্ষপাত, মতামত বা মূল্যায়ন বাঞ্ছনীয় নয়। তবে ভারসাম্য মানে সমান-সমান উপস্থাপন না; পক্ষপাতশূন্যতা মানেও ন্যায়-অন্যায় নিরপেক্ষতা নয়। এসব নিশ্চিত করতে হবে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে, বাস্তবানুগ অনুপাতে।
- ✓ **মানবিক আগ্রহ, মানবিক প্রেক্ষাপট:** ঘটনা মানুষকে কেন্দ্র করে ঘটে, ঘটনার দাম মানুষের প্রয়োজন ও আগ্রহের জন্য। সে জায়গা থেকে ঘটনা দেখতে হয়; সে দিকগুলো এবং ঘটনার সজীব আবহ ফুটিয়ে তুলতে হয়। জড়িত মানুষজন, তাদের অভিজ্ঞতা, প্রয়োজন– এসব প্রত্যক্ষ করে তুললে সংবাদের গ্রাহক ঘটনার সঙ্গে অনায়াসে সম্পৃক্ত হতে পারবেন। বাস্তবতা এবং তার তাৎপর্যও এভাবে সহজে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব।

- ✓ **সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত, সুলিখিত:** যেকোনো লেখায় এ গুণগুলো না থাকলে তা সুপাঠ্য হয় না। ভুল বোঝার অবকাশও থাকে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার খবরের গ্রহণযোগ্যতা ও বোধগম্যতা অনেকখানি নির্ভর করবে সুচারু উপস্থাপনের ওপর।
- ✓ **দায়িত্বশীলতা:** সাংবাদিকের দায়িত্বশীলতার প্রশ্নটি তাঁর সব কাজের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়ানো। তাঁর কাজের ফলাফল বা প্রতিক্রিয়া ব্যাপক ও গভীর হতে পারে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রসঙ্গে এ দায়িত্ব বহুগুণ বাড়ে। জড়িত সব পক্ষের প্রতি ন্যায্যতার দায়িত্বও এখানে বড়।

মনে রাখুন: কয়েকটি কথা আলাদা করে মনে রাখতে বলব।

- ✓ **ঢালাও নয়:** সুনির্দিষ্ট তথ্য-বক্তব্য চাই। ঢালাওভাবে কিছু বলা যাবে না।
- ✓ **অতি-সরল করা নয়:** একইভাবে, অতি-সরল বা অতি-সাধারণী (ওভার-সিম্পলিফিকেশন বা ওভার- জেনারেলাইজেশন) করে কোনো বিষয় বা সমস্যা উপস্থাপন করা যাবে না। ছাঁচে-ঢালা ধারণা বা স্টেরিওটাইপ থেকে এমন হতে পারে। আবার ভাবালুতা থেকেও এটা ঘটা সম্ভব। বুঝতে হবে যে সংবেদনশীলতা আর ভাবাবেগে আপ্লুত হওয়া এক জিনিস নয়।
- ✓ **সম্পাদনায়** সাবধানতা: সম্পাদনা পর্যায়ে প্রতিবেদনে কিছু রদবদল হয়। সম্পাদনাকারী এবং খবরের গেটকিপারদের দায়িত্ব, সেই পর্যায়েও প্রতিবেদনের অবশ্যকরণীয়গুলো নিশ্চিত করা। বিশেষ সতর্কতা দরকার, কেননা সম্পাদনা পর্যায়ে ভুল-ত্রুটি-বিভ্রান্তি হলে তার ঝাপটা এসে পড়ে মাঠের প্রতিবেদকের ওপর।
- ✓ **ভুল স্বীকার, প্রতিবাদ ছাপানো:** তথ্যগত বা যেকোনো ভুল প্রকাশিত হলে দ্রুত তা স্বীকার করে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের নজরে পড়ার মতো জায়গায় বা সময়ে সঠিক জিনিসটি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। অনলাইনে সংশোধনীর নোটে পরিষ্কার বলতে হবে, কবে কী ভুল প্রকাশিত হয়েছিল আর কী সংশোধন করা হয়েছে। কেউ প্রকাশিত বিবরণের প্রতিবাদ করলে বা কোনো ব্যাখ্যা দিলে সেটাও এভাবে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। প্রতিবাদ যদি ভুল বা মিথ্যা হয়, তবু এটা করতে হবে; তবে অবশ্যই পাল্টা উত্তর এবং তথ্য-প্রমাণও তুলে ধরতে হবে।

সব কটি উপায় ব্যবহার করা: সংবাদমাধ্যমে কোনো বিষয় তুলে ধরার যত উপায় আছে, সব কটির সদ্ব্যবহার করা জরুরি।

- ✓ সংবাদ প্রতিবেদন, বিশেষত গভীরতাধর্মী অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক ‘বিশেষ’ প্রতিবেদন, সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন, ধারাবাহিক প্রতিবেদন
- ✓ ফিচার, ছবি-ফিচার, ইনফোগ্রাফিকস
- ✓ ভিডিও, পডকাস্ট– অনলাইনে মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা। এক্সপ্লেইনারসহ নতুন মোড়কগুলোর সদ্ব্যবহার।
- ✓ উপসম্পাদকীয় ও নিবন্ধ
- ✓ রেডিও-টিভির ক্ষেত্রে রুটিন সংবাদ আর ফিচার ও বিশেষ সংবাদ ছাড়াও পর্যালোচনা এবং আলোচনা অনুষ্ঠান বা টক শো

- খুব জরুরি, একটা বিষয়ে লেগে থাকা এবং প্রয়োজনীয় পরবর্তী-প্রতিবেদন বা ফলো-আপ প্রতিবেদন করা।
- বিভিন্ন দিবস ও প্রাসঙ্গিক অনুষ্ঠানের তালিকা রাখুন, খোঁজে থাকুন, খেয়াল রাখুন। সেগুলোর উপলক্ষে খবর করার সুযোগ বাড়ে। যেমন, আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস (আগস্ট ৯) অথবা বিভিন্ন জাতিসত্তার আন্দোলনের দিবস (চা-শ্রমিক দিবস ২০ মে, সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস ৩০ জুন, এবং অন্যান্য। সময় থাকতে প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদনের প্রস্তাব দিন, সম্পাদকেরা গ্রহণ করবেন। একটু বড় জায়গা পাওয়ার সুযোগ পাবেন। এমন দিবস বা উপলক্ষ যে শুধু আদিবাসী-সংশ্লিষ্ট হতে হবে, তা নয়।
    - ✓ তবে এমন দিবস বা উপলক্ষ যে শুধু আদিবাসী-সংশ্লিষ্ট হতে হবে, তা নয়। ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আপনি কোনো জাতিসত্তার ভাষাসংক্রান্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পারেন। ১৬ ডিসেম্বরের আগে থেকে মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী কোনো জনগোষ্ঠীর ভূমিকার তথ্য জানাতে পারেন।
    - ✓ জনশুমারির আগে দিয়ে আদিবাসী জনসংখ্যা নিয়ে খবরাখবর করতে পারেন। অতীতে ভোটার নিবন্ধনে ত্রুটি থাকলে নির্বাচনের আগে সেটার কথা জানান দিতে পারেন। জাতীয় বাজেট ঘোষণার আগে বা পরে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ও প্রয়োজনের বিষয় নিয়ে লিখতে পারেন।

এভাবে সময়োপযোগী কোনো ঘটনার সূত্র ধরে অথবা চলতি আগ্রহের যেকোনো প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য জরুরি বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিক হয় কি না, তা খেয়াল রাখুন। তবে গৎবাঁধা প্রতিবেদন করবেন না।

সম্পাদকীয় নীতি ও সাংবাদিকের ভূমিকা: ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বিষয়ে সম্পাদকীয় নীতি যা-ই হোক, প্রতিবেদকের নিজের চেষ্টা এবং লেগে থাকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

- ধরা যাক, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার খবরাখবর সম্পর্কে আপনার প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকীয় নীতি নেতিবাচক। তখন আপনাকে কৌশলী হতে হবে। আমরা দেখেছি, সাধারণভাবে সংবাদমাধ্যম ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সম্পর্কে সংঘাত-সংঘর্ষ-সহিংসতা, সাংস্কৃতিক খবরাখবর, কিছু জীবনধারাভিত্তিক ফিচার, দিনের বড় ঘটনা, বড় কোনো বিপর্যয়ের খবর প্রকাশ করতে আগ্রহী থাকে। এই খবরগুলোতেই আপনাকে জরুরি বাস্তবতা তুলে ধরতে হবে, গভীরে যেতে হবে। সম্পাদকীয় নীতি নেতিবাচক হলে সেটাই হয়তো আপনার একমাত্র উপায়।
- এমনও হতে পারে যে, সম্পাদকীয় নীতি ইতিবাচক, কিন্তু তা অনুসরণে হেলাফেলা আছে। আপনাকে তখন ডেস্ক, আঞ্চলিক পাতার সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক এবং সুযোগ থাকলে স্বয়ং সম্পাদককে বুঝিয়ে মানাতে হবে। এভাবে নিজের যুক্তি বুঝিয়ে কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করা ব্যক্তি-সাংবাদিকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। টাঙ্গাইলের মধুপুরে ২০০৮ সালে ইত্তেফাক প্রতিনিধি যেমন বলেছিলেন, আগে প্রতিবেদনে তিনি 'আদিবাসী' শব্দটি লিখলেও সম্পাদনার সময় তা বাদ পড়ে যেত; এ নিয়ে এলাকার আদিবাসী নেতারা মনে কষ্ট পেতেন। সুযোগমতো তিনি খোদ সম্পাদককে বুঝিয়ে বলে শব্দটির ব্যবহার নিশ্চিত করেছিলেন।
- প্রতিবেদক তথা সাংবাদিকের দিক থেকে তাগিদ না থাকলে অনেক সময় স্রেফ বেখেয়ালেই খবর করা হয় না। একইভাবে তিনি যদি নিজে থেকে পিছিয়ে যান বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন, তাহলে কোনো কিছু

প্রকাশের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই নষ্ট হয়। আপনার বিবেচনায় প্রকাশ করা জরুরি মনে হলে বার্তা ব্যবস্থাপক বা সম্পাদককে জানাবেন। সেটা যেন প্রকাশিত হয়, সে জন্য সচেষ্ট থাকবেন, নিজের যুক্তিগুলো বোঝাবেন, লেগে থাকবেন।

সংবাদমাধ্যমের প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা: ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের দূরত্ব দূর করার জন্য সম্পাদকীয় নীতি-সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

- নৈতিকতার ভিত্তিতে পরিষ্কার নীতিগত অবস্থান দরকার; সেটা কাজে প্রয়োগ হচ্ছে কি না, সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি চাই।
- নীতি ভিন্ন হলেও সংবাদে সত্যনিষ্ঠ থাকা দরকার। সংবাদকে প্রভাবিত বা বিকৃত করলে কিন্তু বৃহত্তর পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের আস্থা মিলবে না।
- বিশেষ মনোযোগ দরকার সহিংসতা, সংঘাত-সংঘর্ষের খবরে। এগুলো যেন উসকানিমূলক না হয় এবং সঠিক প্রেক্ষাপটে যথাযথ সত্য যেন জানানো হয়।
- মাঠের প্রতিবেদককে গুরুত্ব দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় সব রকম সহযোগিতা দেওয়া দরকার। মাঠের প্রতিবেদকের জন্য কোনো বিশেষ খবর করা ঝুঁকিপূর্ণ হলে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে জেলা বা ঢাকার সাংবাদিককে পাঠিয়ে খবরটি করানো যায়।
- প্রতিবেদক এবং সম্পাদনাকারীদের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিনিধি এবং তাদের বিষয়ে গবেষক বা উন্নয়নকর্মীদের সঙ্গে সময় সময় পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগের সাংবাদিকদের আলাপ-আলোচনার সুযোগ করে দেওয়া যায়।
- খুবই জরুরি হচ্ছে, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংবাদিকদের যোগ্যতার ভিত্তিতে বা গড়েপিটে নেওয়ার সুযোগ রেখে নিয়োগ দেওয়া।

৫

প্রতিবেদন করার সুযোগ

এর আগে আমরা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য জরুরি বিষয়গুলো মোটাদাগে দেখেছি। সেগুলো ধরে বৈচিত্র্যপূর্ণ অনেক খবর করার সুযোগ আছে। সাংবাদিকের দেখা দরকার, এমন বিষয়ের অভাব হবে না।

- আছে ভূমির অধিকার থেকে শুরু করে সরকারি নীতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব, সংঘাত-সংঘর্ষ, আইনগত সুরক্ষার প্রশ্ন।
- দারিদ্র্য, জীবিকার অভাব বা সংকটের সঙ্গে অনেকগুলো বিষয় জড়িয়ে আছে। জুমচাষের মতো পেশাগত জীবিকা নিয়ে যে বিতর্ক চলে, তার গভীরে খতিয়ে দেখার গুরুত্ব আছে। দুর্গমতার কারণে সৃষ্ট প্রান্তিকতার সমস্যাগুলো দেখার আছে। পেশা পরিবর্তনের বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা যায়।
- আছে সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনাধারার নানা দিক। এর সমস্যা ও সংকট যেমন আছে, তেমনি রয়েছে আকর্ষণীয় বর্ণাঢ্য দিক। অঞ্চলে অঞ্চলে আদিবাসীদের ঐতিহ্যিক বুনন ও হস্তশিল্প দেখার আছে।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকটগুলো নিয়ে গভীরে গিয়ে প্রতিবেদন ও ফিচার হতে পারে।
- পুরোনো এবং নতুন অধিকার আদায়ের আন্দোলনগুলো ধরে গভীরে গিয়ে প্রতিবেদন করা দরকার।
- কোনো জনজীবনই শুধু সমস্যা-সংকটের নয়। লোকায়ত জ্ঞানের গভীরে নজর দিলে আকর্ষণীয় প্রতিবেদন ও ফিচার হবে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত সাফল্য, উত্তরণ ও বিজয়ের খবরের আলাদা আকর্ষণ আছে। এগুলো খবর হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। তবে বাস্তবে সমস্যা ও আশাব্যঞ্জক খবরের যে অনুপাত আছে, সংবাদমাধ্যমে প্রতিফলনের সময় সেটা অনুসরণ করতে হবে। শুধু ইতিবাচক খবর প্রকাশ করে চললে মনে হবে, এদের কোনো সমস্যা নেই; সেটা মিথ্যা দেখানো হবে।

মনে রাখুন

আদিবাসীদের মধ্যেও দুটি অংশ বিশেষভাবে উপেক্ষিত: ক্ষুদ্রতর জাতিসত্তারা ও সমতলের আদিবাসীরা। এদের উপেক্ষা করলে প্রতিফলনে বড় রকম ঘাটতি থাকবে।

ক্ষুদ্রতর জাতিসত্তা

- পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা বা ত্রিপুরা, টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহের গারো, সিলেটের মণিপুরী বা খাসিয়া– এমন বড় কিছু জাতিসত্তার খবর কিছুটা হলেও সংবাদমাধ্যমে আসে। এদের ঘিরে রাজনৈতিক বা অন্যান্য বড় ঘটনার দ্বন্দ্ব থাকে এবং এদের সাংস্কৃতিক বর্ণাঢ্যতা চট করে চোখে পড়ে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের মধ্যে যারা ক্ষুদ্রতর, সংবাদমাধ্যমে তাদের কথা কিন্তু খুব কম আসে।

- যত দুর্গম বা প্রত্যন্ত এলাকা, যত ছোট গোষ্ঠী, তত ফাঁকে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। আবার যাতায়াতের নাগালের মধ্যে থাকলেও ক্ষুদ্রতর জাতিরা উপেক্ষিত হয়। এদের প্রতি নজর দিতে সাংবাদিককে বিশেষ যত্নবান ও সজাগ হতে হবে। এরাই কিন্তু প্রশাসন ও উন্নয়নকর্তাদের কাছেও অবহেলিত থাকে।
- এদের কথা না এলে সংবাদমাধ্যমে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিফলনে বড় ঘাটতি রয়ে যাবে। এমন ক্ষুদ্রতর জাতিগোষ্ঠী আছে প্রায় সব অঞ্চলে। টাঙ্গাইলে যেমন কোচ আর হাজং; সিলেটে পাত্র; পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মারমা বা ত্রিপুরা বাদে অন্য জাতিগোষ্ঠীগুলো। সিলেট অঞ্চলের চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীরাও এ বিবেচনার দাবিদার।

সমতলের আদিবাসী

- একই রকম উপেক্ষার শিকার সমতলের আদিবাসীরা। রাজনৈতিক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে, বৈচিত্র্যের আকর্ষণে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অপেক্ষাকৃত ছোট দু-একটি গোষ্ঠী তবু হয়তো মনোযোগ পায়। কিন্তু সমতলের বড় গোষ্ঠীও সাংবাদিকের নজরের আড়ালে রয়ে যায়। সাঁওতালেরা যেমন বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আদিবাসী জাতিসত্তা। সে তুলনায় তাদের খবর চোখে পড়ে কই?
- ভুঁইমালী, বর্মণ বা মালোর মতো বাঙালি হিন্দুসমাজের কোনায় স্থান পাওয়া অনেকগুলো গোষ্ঠী একই সঙ্গে সমতলবাসী এবং ক্ষুদ্রতর। ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হারিয়ে বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতিতে মিশে যাওয়া এসব গোষ্ঠীকে সব সময় ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে আলাদা করে দেখা হয় না। ভ্রাম্যমাণ বেদে বা সিলেট-মৌলভীবাজারের চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীর তো ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়াটুকুও দুষ্কর।

বিশেষ কিছু বিষয় ও কৌশল

নজর দেব বিশেষ কিছু বিষয়ে প্রতিবেদন করার জরুরি কয়েকটি দিক এবং কৌশলের দিকে।

১. সংঘাত-সংঘর্ষ-সহিংসতা: আপনাকে সম্ভবত এমন ঘটনার প্রতিবেদনই সবচেয়ে বেশি করতে হবে। এ কাজই সবচেয়ে কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ। কিছু করণীয় ও পরামর্শ:

- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষকে জড়িয়ে সংঘাত-সংঘর্ষ বা তাদের প্রতি সহিংসতার মূলে প্রায়ই থাকে জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব; তাদের বনে থাকা বা বন ব্যবহারের অধিকারের দাবি; এবং তাদেরকে উৎখাতের চেষ্টা। তাদের প্রথাগত অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট আইনগুলোসহ সার্বিক ভিত্তিজ্ঞান দরকার।
- অনেক সন্ত্রাস-সংঘর্ষ জটিল হয়, সহিংসতার দীর্ঘ ইতিহাস বা প্রেক্ষাপট থাকে। আপনার সেগুলো জানা থাকতে হবে। প্রামাণ্য দলিলপত্র দেখতে হবে। অনেকগুলো পক্ষ, তাদের অনেক কথা। মূল বিষয়বস্তুগুলো; অর্থাৎ সংঘর্ষ-সহিংসতার মূল কারণ বা ক্ষোভের প্রধান উৎস চিহ্নিত করতে হবে। সচরাচর নানামুখী ছোট ছোট কারণ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকে। সব কটি দেখতে হবে, বুঝতে হবে।
- দুর্বল বা অন্যায়ের শিকার কোনো পক্ষের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবেন, তবে একপেশে হলে চলবে না। যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ ও পক্ষপাতহীন তথ্য দেবেন। প্রমাণ হাতে রাখবেন।

- সব তথ্য পাল্টাপাল্টি যাচাই অত্যাবশ্যক। এসব সময়ে যে যার মতো করে ব্যাখ্যা দেয়, অতিরঞ্জন হয়। ইচ্ছা করে বিভ্রান্ত করার লোক আছে অনেক। ছেঁকে সত্য বের করতে হয়। প্রেক্ষাপটে সঠিক অবস্থানে উপস্থাপন করবেন। বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলা থেকে সাবধান থাকবেন।

- সতর্ক থাকুন– রং চড়ানো, উসকানিমূলক উপস্থাপন, ঢালাও কথা বলা বা নাটকীয় করে দেখানো একেবারেই চলবে না। সংঘাত-সংঘর্ষে নাটকীয়তা থাকে, কিন্তু বিষয়বস্তু গুরুতর। এবং অনেকের জন্য এটা জীবন-মরণের প্রশ্ন। দায়িত্বজ্ঞানহীন লেখা বা ছবি সংঘাত আরও বাড়িয়ে দেবে।

- সংঘর্ষ-সহিংসতার ভুক্তভোগীদের পরিস্থিতি, ক্ষয়ক্ষতি, বিপর্যয় গুরুত্ব দিয়ে বলা দরকার। এভাবে প্রতিবেদনে মানবিক প্রেক্ষাপট আসবে। ঘটনাগুলোর তাৎপর্যের এটি একটি বড় দিক।

- ঘটনা আপাতদৃষ্টে বাঙালি জনগোষ্ঠী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে রূপ নিতে পারে। কিন্তু পেছনে প্রায়ই থাকে ক্ষমতাবানের স্বার্থ। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান– বন বিভাগ, প্রশাসন, পুলিশ, সামরিক শক্তি– ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে। কার কী ভূমিকা এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব ঠিক কী, প্রতিবেদনে সেটা পরিষ্কার করতে হবে। নিছক বাঙালি-আদিবাসী দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখানো অতি সরলীকরণও ভুল হবে।

- এসব ঘটনায় নিপীড়ন-নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এবং নজির থাকে। অনুষঙ্গী থাকে নারীর যৌন হয়রানি বা নির্যাতন। অভিযোগগুলো সরেজমিন খতিয়ে দেখতে হবে এবং তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিষয়টি প্রতিবেদনে গুরুত্ব দিতে হবে। পক্ষ নেবেন না, কিন্তু দায়িত্ব কার বলে প্রমাণ মিলছে বা জোরালো অভিযোগ উঠছে, সেটা বলবেন।

- যত বেশি মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন, ঘটনা তত পরিষ্কার হবে। একেকজন একেকভাবে দেখে, বর্ণনার মধ্যে তার মতামত-আবেগ-মূল্যায়ন ঢুকে যায়। খুব জটিল ঘটনা হলে এবং পরস্পরবিরোধী বক্তব্য আসতে থাকলে যথাসম্ভব বেশিজনের কাছ থেকে আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনবেন। তাতে মিলিয়ে দেখে যাচাই করতে পারবেন এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ পরিষ্কার হবে। এক সূত্র থেকে অন্য সূত্রের হদিস পাবেন।

- নারী ও শিশুদের সঙ্গে অবশ্যই কথা বলুন। নতুন ও গভীর দৃষ্টিকোণ পাবেন।

- অভিযুক্ত পক্ষের সঙ্গে কথা বলতেই হবে, তবে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যেন তাতে ভুল না বোঝে, সেটা নিশ্চিত করবেন। অভিযুক্ত পক্ষ এবং প্রশাসন বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন সবার শেষে।

- সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে প্রতিবেদন করার উদ্দেশ্য ন্যায্যতা আনা এবং তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ সত্য তুলে ধরে জরুরি দিকনির্দেশ দেওয়া। সবার বক্তব্য সঠিক, অবিকৃত ও যথাযথভাবে তুলে ধরতে সজাগ থাকবেন। এভাবে আপনার প্রতিবেদন পক্ষগুলোর মধ্যে পরোক্ষ আদান-প্রদানের মাধ্যম হতে পারে এবং দ্বন্দ্ব মীমাংসায় সহায়তা করতে পারে। আপনার নিজের নিরাপত্তার জন্যও সব পক্ষের বক্তব্য তুলে ধরা জরুরি।

- যাদের কাছ থেকে তথ্য পাচ্ছেন, তাদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রাখতে হবে। তাদের নাম-পরিচয় নিশ্ছিদ্রভাবে গোপন রাখতে হতে পারে। নিপীড়নের শিকার দুর্বল পক্ষের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা দরকার।

- সংঘাত-সংঘর্ষ বা সহিংসতার পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পর্যবেক্ষকেরা এলাকায় যান। তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন। তবে অন্যান্য সূত্রে এবং নিজের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তথ্য পাল্টাপাল্টি যাচাই করতে হবে। এমন পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে কথা বলার একটি বিশেষ সুবিধা আছে। অন্য কোনো সূত্র নাম প্রকাশ করে তথ্য দিতে না পারলে, এঁদের আপনি উদ্ধৃত করতে পারেন। স্পর্শকাতর অনেক কথা এঁদের মুখ দিয়ে চলে আসতে পারে।

২. মানবাধিকার লঙ্ঘন: সন্ত্রাস-সহিংসতা ছাড়াও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে। যেমন:

- ✓ নাগরিক অধিকার হিসেবে প্রাপ্য কোনো সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া।
- ✓ জীবিকার সুযোগ না পাওয়া।
- ✓ সরকারের অবহেলা বা বৈষম্য।
- ✓ নিজেদের প্রথা-রীতি চর্চা করতে না পারা।
- ✓ সুবিচার না পাওয়া।

- এমন যেকোনো ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ, তা যতই ছোট হোক। ছোট ছোট ক্ষোভ বা বঞ্চনা থেকে গড়িয়ে অনেক বড় ঘটনা হয়ে যেতে পারে।
- প্রতিবেদনে কোনো পক্ষ না নিয়ে স্বতন্ত্র অবস্থান বজায় রাখবেন। তবে মনে রাখবেন, নিরপেক্ষতা কখনোই ন্যায়-অন্যায় নিরপেক্ষ নয়। আপনাকে সংবেদনশীল ও ন্যায্য হতে হবে।

৩. পরিবেশ এবং উন্নয়ন: এর দুটি দিক আছে–

- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের মানবাধিকার লঙ্ঘন, জীবন-জীবিকা-আবাস থেকে উচ্ছেদ-উৎখাতের মতো অনেক ঘটনা ঘটে পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের দোহাই দিয়ে। যেমন, রাঙামাটিতে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বা টাঙ্গাইলের মধুপুর বনে বিদেশি গাছের জ্বালানি বন। এ থেকে অনেক সংঘাত-সহিংসতার সূত্রপাত হয়। টাঙ্গাইল ও মৌলভীবাজারে ইকোপার্ক নিয়ে যেমনটা ঘটেছে। আদিবাসী এলাকায় পরিবেশ ও উন্নয়ন নিয়ে যেকোনো প্রসঙ্গে ব্যাপকতর এই প্রেক্ষাপট এবং ঘাত-প্রতিঘাতের মাত্রাটি মাথায় থাকা দরকার। প্রতিবেদনেও সেটা আসতে হবে।
- অন্যদিকে, যেসব কাজ যথার্থই পরিবেশের ক্ষতি করে, সেগুলো যথাযথ চিহ্নিত করে প্রতিবেদন করতে হবে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষজন যদি বন ধ্বংস করে আবাদ করে, সেটা নিয়ে প্রতিবেদন করতে হবে; তবে সঠিক ও সুনির্দিষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গভাবে, সব দিকের তথ্য-প্রমাণসহ। এমন ঘটনার জরুরি দিক, ওই মানুষদের বিকল্প জীবিকার প্রয়োজনীয়তা। প্রতিবেদনে সে দিকটি গুরুত্ব পাবে।
- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য কোনো উন্নয়নমূলক কাজ যদি অন্য কারও অন্যায্য ক্ষতি করে বা অযৌক্তিক বৈষম্য সৃষ্টি করে, সেটা চিহ্নিত করতে হবে। তবে এমন বিষয়কে দেখতে হবে তাদের সুযোগবঞ্চনার বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে। দুর্বল ও সুযোগবঞ্চিতজনের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ বা পজিটিভ অ্যাকশন ন্যায্য।

৪. সংস্কৃতি-জীবনধারাঃ সবকিছু মিলিয়ে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে গভীর প্রতিবেদন করার সুযোগ এবং প্রয়োজন ব্যাপক। আপনি হয়তো ক্ষুদ্র কোনো জাতিসত্তার সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে ফিচার করছেন বা ছোট্ট কোনো বর্ণাঢ্য প্রতিবেদন। মনে রাখুনঃ

- এসব প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে আদিবাসী জীবনের চিত্রটি পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের সামনে স্পষ্ট করে তুলতে পারেন। উৎসব, সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রথা, প্রথার কারণ, পেছনের গল্প, ভালো-মন্দ দিক, জীবনধারার বাঁক– এসব একটি জাতি সম্পর্কে পাঠককে সহজে আকর্ষণীয় করে জানানোর খুব ভালো সুযোগ।

- ভাষার দাবিতেই ছিল বাংলাদেশের অঙ্কুর। জীবনধারা, ভাষা ও সংস্কৃতি যেকোনো জাতির অস্তিত্বের সঙ্গে জড়ানো বিষয়। সে বিষয়ের খবর সব সময় জরুরি, তবে গভীরে যাওয়া চাই।

- আদিবাসী সংস্কৃতি ও জীবনধারার প্রতিবেদনে পাঠক-দর্শক-শ্রোতার জন্য থাকে বৈচিত্র্যের আকর্ষণ। আবার ক্ষুদ্র জাতিসত্তার চলতি জীবনের প্রেক্ষাপটে জরুরি অনেক প্রসঙ্গও উঠে আসতে পারে। যেমন, বাংলাদেশের সব কটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যে কেবল গারো ও খাসিয়ারাই মাতৃসূত্রীয় বা মাতৃবংশীয়। অর্থাৎ তাদের উত্তরাধিকার ও বংশপরিচয় মায়ের ধারা অনুসরণ করে হয়। বিয়ের পর স্বামী বাস করে স্ত্রীর বাড়িতে। সম্পত্তি হয় মায়ের, পায় মেয়েরা। এ সম্পর্কে জানতে বাঙালিরা স্বভাবতই আগ্রহী হবে। আবার, গারো বা খাসিয়াদের মধ্যেও নারীর অবস্থান আসলেই কেমন, তা খতিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ আছে।

- এদিকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি-সমাজ দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। জমিসহ সম্পদের ওপর গোষ্ঠীর মালিকানা বদল হয়েছে ব্যক্তিমালিকানায়। টাকা, বিনিয়োগ, মুনাফার মতো ধারণাগুলো এসেছে। বাঙালি সমাজের অনেক রীতি-রেওয়াজ ধারা তারা গ্রহণ করে নিয়েছে। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় ও আধুনিক শিক্ষার প্রভাব মূল্যবোধ ও জীবনদর্শনে বদল আনছে। ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে বা তার সঙ্গে সংঘাত হচ্ছে। আদিবাসী ও বাঙালি ছেলেমেয়ের বিয়ে হচ্ছে।

- অন্যদিকে, আছে ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা। উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তের গোষ্ঠীদের ওপর সনাতন ধর্মের এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের গোষ্ঠীদের ওপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অনেক আগে থেকে ছিল। ব্রিটিশ আমল থেকে তাদের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া চলেছে; মুসলমান হওয়ার নজিরও আছে। এসব বিষয়ে নানা রকম প্রতিবেদন হতে পারে।

- এমন হতে পারে যে, নিরাপত্তার ঝুঁকি বা বাধাবিঘ্নের কারণে স্পর্শকাতর কোনো বিষয়ে লিখতে পারছেন না, অথচ জানানো দরকার। তখন কিন্তু জীবনধারার মোড়কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্দোষভাবে বলে ফেলা যায়। সমস্যা-সংকটের চিত্র খুব ভালোভাবে তুলে ধরা সম্ভব।

৬

সতর্কতার কয়েকটি ক্ষেত্র ও কৌশল

- **নিরাপত্তা, নিজের এবং সূত্রের:** সাংবাদিককে কিছু ঝুঁকি তো নিতেই হয়, কিন্তু অহেতুক বা অযৌক্তিক ঝুঁকি নেবেন না। কাজটা অ্যাডভেঞ্চার নয়। ঝুঁকি বিচার করে ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করবেন।

    ✓ প্রতিটি কাজের ঝুঁকি আগে পরিষ্কার ভাববেন, প্রতিবেদনের জন্য কাজটা করা অত্যাবশ্যক কি না তা ভাববেন; করা জরুরি হলে সেই মতো ব্যবস্থা নিয়ে এগোবেন। অফিসে সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের মধ্যে বিশ্বস্ত কাউকে সব খুলে বলবেন, তবে ঢোল পেটাবেন না।

    ✓ কখনো কয়েকজন প্রতিবেদক মিলে ঘটনাস্থলে যেতে পারেন, তাতে ঝুঁকি কমে। এলাকায় নিজের বিশ্বস্ত কাউকে আগে জানিয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নেবেন।

    ✓ দূরের জায়গা হলে এমনভাবে পরিকল্পনা করবেন, যেন দিন থাকতে ফিরতে পারেন। নয়তো রাতে নিরাপদ আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করবেন।

    ✓ আপনার উপস্থিতি যত কম নজরে পড়ে, তত ভালো। অহেতুক শোর তুলবেন না। তবে যদি মনে করেন, জানান দিয়ে গেলেই নিরাপদ হবে, সেটা করবেন।

    ✓ প্রতিটি পরিস্থিতি আলাদা বিচার করে দেখতে হবে। খুব ঝুঁকিপূর্ণ মনে হলে আঞ্চলিক প্রতিবেদক কেন্দ্রীয় অফিসের কাউকে আনিয়ে তাঁর আড়ালে কাজ করবেন বা তাঁকেই কাজটা করতে দেবেন।

    ✓ একইভাবে সূত্রের এবং ঘটনায় জড়িত মানুষদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবুন।

    ✓ প্রয়োজনে প্রতিবেদনে নাম-পরিচয় দেবেন না। প্রতিবেদনে সূত্র উল্লেখ করতে হয়, তবে সেটা কৌশলেও করা যায়।

    ✓ প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত সূত্রের খোঁজখবর নিন।

    ✓ বিশেষভাবে সতর্ক থাকবেন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষজনসহ দুর্বল অবস্থানের সাধারণ মানুষদের বেলায়।

- **সব পক্ষের আস্থা:** আবারও মনে করিয়ে দিই, আস্থা পেতে হবে সব পক্ষের। সতর্ক থাকুন:

    ✓ কোনো পক্ষের প্রচারযন্ত্রে পরিণত হবেন না।

    ✓ কোনো পক্ষের লোক বলে চিহ্নিত হবেন না। হলে ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন না, আপনার নিরাপত্তার ঝুঁকিও বাড়বে।

- ✓ সব পক্ষই যেন এ আস্থা পায় যে, সাংবাদিক সত্য লিখবেন। তাতে আপনার সূত্র এবং তথ্য পেতেও সুবিধা হবে। আদিবাসী প্রশ্নে এত রকম স্বার্থ ও রাজনীতি এবং অন্যায় জড়িত যে স্বতন্ত্র অবস্থান রাখা কঠিন, কিন্তু রাখতেই হবে।
- ✓ সাংবাদিকের চিন্তাভাবনা যেন জাতিগত বিভাজনের ফাঁদে পড়ে না যায়। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কোনো ব্যক্তি যখন সাংবাদিক হবেন, তাঁকেও নিজের মনের ছাঁচে-ঢালা ধারণাগুলো সম্পর্কে এবং স্বতন্ত্র অবস্থানের বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

- **পুলিশ-সেনা-প্রশাসনঃ** ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের জন্য জরুরি বিষয়গুলোতে পুলিশ-সেনা-প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকে। কখনো বা প্রায়ই এরা ঘটনায় বিশেষভাবে জড়িত পক্ষ হয়। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের পক্ষ থেকে এদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ওঠে।
  - ✓ এদের সঙ্গে সবার শেষে কথা বলতে চেষ্টা করবেন। তাতে অভিযোগগুলো সব জিজ্ঞাসা করতে পারবেন। আবার, এরা আপনার কাজে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।
  - ✓ এদের কাছ থেকে তথ্য আদায়ে দৃঢ় হবেন। তথ্য অধিকার আইন কাজে লাগাবেন। এরা যা বলবে, তার সমর্থনে কাগজপত্র তথ্য-প্রমাণ অবশ্যই চাইবেন। একাধিক সূত্রে যাচাই করবেন।
  - ✓ ক্ষমতাকেন্দ্র হিসেবে এদের কার্যকলাপের ওপর নজর রাখবেন। প্রয়োজনে জবাবদিহি চাইতে দ্বিধা বা ভয় করবেন না।
  - ✓ এরা অনেক সময় আপনার প্রতিবেদন আগাম দেখিয়ে নিতে বলতে পারে, দৃঢ়ভাবে তা ঠেকাবেন।
  - ✓ এ সূত্রগুলো এবং গোয়েন্দাসূত্র নিজেদের মতো করে তথ্য দিতে চায়। সেটা না নিলে হুমকি আসে বা পরে আপনি চিহ্নিত হয়ে যান। পার্বত্য চট্টগ্রামে এটা বড় বাস্তবতা। পত্রিকার সমর্থন বা জোর না থাকলে প্রতিবেদক একা ঠেকাতে পারেন না।

- **দ্বন্দ্ব স্বার্থেরঃ** ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘাত-সংঘর্ষ বা তাদের প্রতি সহিংসতার ঘটনা আদিবাসী-বাঙালি দ্বন্দ্বের চরিত্র পাওয়ার বিষয়টি একটু ভালো করে বোঝা দরকার।
  - ✓ বিভিন্ন ক্ষমতাকেন্দ্র উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিষয়টি সেদিকে নিতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু দ্বন্দ্বটি আসলে স্বার্থের। সে স্বার্থ প্রায় সময় হয় প্রবল কোনো পক্ষের বা বাইরের বড় কোনো মহলের। পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি উদ্যোগে বাঙালি অভিবাসন এবং সেটা থেকে সৃষ্ট দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাটি এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ।
  - ✓ প্রতিবেদককে স্বার্থের দ্বন্দ্বের মাত্রাটি মনে রাখতে হবে, খুঁজতে হবে, বুঝতে হবে। বাস্তবে যা দেখছেন, তা আপনাকে বলতেই হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘন যার ক্ষেত্রেই হোক, সেটা পরিষ্কার জানাতে হবে। কিন্তু প্রতিবেদনে স্বার্থের দ্বন্দ্বের সঠিক প্রেক্ষাপট থাকা চাই।
  - ✓ বিবরণ যেন এমন দ্বন্দ্বকে জাতিগত বিভেদ হিসেবে না দেখায়। দেখালে তা প্রায় কখনোই পুরোপুরি সত্য হবে না। পক্ষান্তরে এমন প্রতিবেদন জাতিগত বিভেদকে উসকে দেবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাংবাদিকদের এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার।

- **প্রত্যেকে আলাদা:** সতর্ক থাকুন, ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের সাধারণীকরণ করে বা অতি সরল করে দেখানো ভুল হবে। প্রতিটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। আবার, সব মানুষ বা জনগোষ্ঠীর মতো একই জাতিসত্তার মধ্যেও বৈপরীত্য-বৈচিত্র্য বা টানাপোড়েন আছে।
  - ✓ যেমন ধরুন, সব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ধর্মে বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টান নয়। হিন্দু, মুসলিম বা সর্বপ্রাণবাদী আদিধর্মের অনুসারী জাতি আছে। একই জাতির মধ্যে ধর্মের পার্থক্য আছে। সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি, জীবনাচরণে পার্থক্য আছে। আছে পরিবর্তনের প্রবণতা এবং তাতে পার্থক্য।
  - ✓ আমাদের সাধারণ একটা ধারণা আছে যে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীগুলো মাতৃতান্ত্রিক। সবাই কি আসলেই তাই? সব জাতিগোষ্ঠীতে নারীর অবস্থান বা গুরুত্ব সমান নয়।
  - ✓ প্রতিটি পরিস্থিতিও আলাদা। যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সব বাঙালি-আদিবাসী পরিস্থিতি এক নয়। একই ধরনের হলেও কোনো সমস্যা বা দ্বন্দ্ব এক নয়।

- **পার্বত্য চট্টগ্রাম:** পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসতা, সংঘাত-সংঘর্ষ এবং আদিবাসী ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব জটিল একটি পরিস্থিতি। এর সব কটি মাত্রা নিজে আগে ভালো বোঝা দরকার।
  - ✓ কারণগুলোর দীর্ঘ ইতিহাস জানতে হবে। যেমন, দুই দশকের ওপরে চলা গৃহযুদ্ধ, সরকারি উদ্যোগে ব্যাপক হারে বাঙালি অভিবাসন, আদিবাসীদের বড় দলটির সঙ্গে সরকারের শান্তিচুক্তি এবং এর প্রতিক্রিয়া।
  - ✓ এর রাজনৈতিক মাত্রাগুলো বুঝতে হবে।
  - ✓ ভৌগোলিক কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ সময় ও ব্যয়সাধ্য। সংবাদমাধ্যমের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। সেনা উপস্থিতির কারণে সেখানে তথ্য সংগ্রহ বা কাজ করা কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ। সংবাদমাধ্যমের জোরালো সমর্থন থাকলেও প্রতিবেদক সব সময় ঝুঁকি নিতে পারেন না।
  - ✓ প্রতিবেদকের দিক থেকে সঠিক ও প্রামাণ্য তথ্য দেওয়া, সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলা এবং নিজের স্বতন্ত্র অবস্থানের জানান দেওয়া অপরিহার্য। অবস্থা বুঝে কৌশল কাজেরই অঙ্গ হয়ে যায়।
  - ✓ খুব জরুরি, যেন আপনি কোনো একটি পক্ষের বলে চিহ্নিত না হয়ে যান। কিন্তু সব পক্ষের আস্থা পাওয়া কঠিন।
  - ✓ অভিবাসী বাঙালিদের কারণে সেখানে জাতিগত বিভাজনের মনস্তত্ত্ব প্রবল। অভিবাসী বাঙালিরা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিবেদককে বিশ্বাস করেন না; উল্টোও সমান সত্য।
  - ✓ সেখানকার বাস্তবতায় একটা বিষয় মনে রাখা দরকার– অভিবাসী বাঙালিরাও এক অর্থে সরকারের নীতির শিকার। প্রতিবেদক যদি তাদের দুর্গতির কথা প্রকাশ করেন, তাতে সত্য প্রকাশই হয়। বিষয়টি জটিল। তবে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে সেখানে সাংবাদিকতা করার সুযোগ নেই।

- **প্রতিবেদন গোছানো ও লেখা:** বিষয়গুলো বড়, জটিল ও স্পর্শকাতর। প্রতিবেদনের বিন্যাস গোছালো এবং লেখা সঠিক ও সাবলীল হওয়া খুব জরুরি। কয়েকটি দিকে নজর চাই:
  - ✓ সবার আগে নিজেকে খুব ভালো করে প্রতিবেদনের মূল থিম, মূল ভাব, ফোকাস বা মূল বিষয়বস্তু চিহ্নিত করতে হবে; গবেষণা করা চাই। প্রতিবেদনের বিষয়গুলো বুঝতে হবে; না হলে বুঝিয়ে লিখতে পারবেন না।
  - ✓ অধিকাংশ পাঠকের জন্য বিষয়গুলো অচেনা হবে। প্রেক্ষাপট ও পশ্চাৎপট দিতে আলাদা যত্ন চাই। বিশেষ বিশেষ শব্দ, ধারণা বা বিষয়ের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা লাগবে। সেসব ব্যাখ্যা উপযুক্ত সূত্র উল্লেখ করে উপস্থাপন করতে হবে। শব্দসংক্ষেপ একবার ভেঙে লিখতে হবে।
  - ✓ প্রতিবেদনে প্রসঙ্গগুলো পরিষ্কার যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করা চাই। তালগোল পাকিয়ে গেলে, এলোমেলো হলে, জটিল বিষয় বোঝা কঠিন। প্রতিবেদনের ফোকাস যেন ঠিক থাকে, বিষয়বস্তু ছড়িয়ে গেলে চলবে না।
  - ✓ তথ্য-প্রমাণভিত্তিক বিশ্লেষণ জায়েজ এবং দরকার, তবে প্রতিবেদনে নিজের মূল্যায়ন থাকবে না। মূল্যায়নধর্মী শব্দ, বিশেষণ একেবারে বাদ। প্রসঙ্গ বা বিষয়গুলো উপস্থাপনের পারম্পর্যে বা ধরনেও যেন মূল্যায়ন চলে না আসে।
  - ✓ সতর্ক থাকুন, লেখায় যেন একপেশে ঝোঁক না আসে এবং কোনো কিছুর আংশিক উপস্থাপনা না হয়। প্রতিবেদন ছোট রাখার তাগিদ থাকে, তবে জরুরি জিনিসগুলো সঠিক প্রেক্ষাপটসমেত পূর্ণাঙ্গ আসা চাই। বিশেষ সতর্ক থাকুন, কারও বক্তব্য যেন খণ্ডিত বা বিকৃত হয়ে না যায়।
  - ✓ ঢালাওভাবে কোনো কিছু উপস্থাপন করবেন না। তথ্য ও উপস্থাপন সুনির্দিষ্ট হতে হবে। একপেশে এবং ঢালাও কথাবার্তা পুরো প্রতিবেদন মাটি করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। বিশেষ সতর্কতা চাই অভিযোগ উপস্থাপনের বেলায়। ঢালাও অভিযোগ ভুল এবং অন্যায্য।
  - ✓ লেখা যেন সহজে বোঝা যায়, পড়তে ভালো লাগে; স্বচ্ছন্দ ও আকর্ষণীয় হতে হবে; তবে চমক, চটক বা সেনসেশন তৈরি করা যাবে না। এই বইয়ে আদিবাসী সংস্থা-সংগঠনের জন্য পরামর্শের অংশে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে লেখার পরামর্শগুলো দেখুন।
  - ✓ ছবি, ইনফোগ্রাফিকস, ভিডিও, অডিওসহ মাল্টিমিডিয়া উপকরণ ব্যবহার করুন।
  - ✓ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের নামের সঠিক বানান জেনে নেবেন। প্রতিবেদক বাঙালি হলে অপরিচিত নামে ভুল হয়ে যায়।
  - ✓ সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ের প্রতিবেদনে আদিবাসী ভাষার অনেক শব্দ চলে আসে। সঠিক শব্দ ও বানান জেনে নিন।

সাংবাদিক তথা সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার দূরত্ব দূর হলে সংবাদে তাদের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত হতে পারে। এর ফলে সংবাদের গ্রাহকের কাছে, মানুষের কাছে, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অবস্থা ও অবস্থানের সত্য চিত্রটি পৌঁছানোর সুযোগ হবে। অন্যদিকে, সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিক হয়ে উঠতে পারবে ঘটনা এবং বিষয়গুলোয় জড়িত সব পক্ষের মধ্যে পরোক্ষ যোগাযোগের মাধ্যম।

আদিবাসী
সংস্থা-সংগঠনের জন্য

১

আদিবাসী প্রতিনিধিদের করণীয়

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার দূরত্ব দূর করার উপায় খুঁজতে টাঙ্গাইল, মৌলভীবাজার ও রাঙামাটিতে ২০০৮ সালে এমআরডিআই তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। সেগুলোয় আদিবাসী প্রতিনিধিরা কিছু সাধারণ ক্ষোভের কথা জানান। বড় দুটি ক্ষোভ:

- ✓ সংবাদমাধ্যম আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোর জন্য জরুরি বিষয়গুলোর বেশির ভাগই উপেক্ষা করে।
- ✓ বিভিন্ন বিষয়ে ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রকাশিত হতেও দেখা যায়। এর প্রতিবাদ জানালে সেটা প্রকাশের নিশ্চয়তা থাকে না।

অর্থাৎ তাঁদের মূল ক্ষোভ সংবাদমাধ্যমে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার খবরাখবর প্রতিফলনে ঘাটতি নিয়ে।

পক্ষান্তরে তিনটি গোলটেবিলেই স্থানীয় সাংবাদিকেরা তথ্য না-পাওয়ার সমস্যার কথা বলেন। তাঁরা বলেন:

- ✓ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিনিধিরা নানা কারণে দায়িত্ব নিয়ে তথ্য দিতে ভয় করেন, পিছিয়ে যান।

এভাবে দুই পক্ষের কথাবার্তা থেকে বাস্তব কিছু সমস্যা ও বাধার যেমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তেমনি সার্বিকভাবে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আদিবাসী প্রতিনিধিদের দূরত্বের প্রেক্ষাপটও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দূরত্ব দূর না হলে প্রতিফলনের ঘাটতিও কমবে না বা দূর হবে না।

বোঝাপড়া ও করণীয়: দূরত্ব পারস্পরিক ব্যাপার। তা কাটিয়ে উঠতে এবং সাংবাদিকের কিছু সমস্যা কমিয়ে আনতে আদিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণে কর্মরত এনজিও, সিবিও, সংগঠন এবং নেতা-প্রতিনিধিদেরও সচেতন চেষ্টা একান্ত দরকার।

প্রথম কথা, এ ঘাটতি কেন হয়, সেটা তাঁদের বুঝতে হবে। অর্থাৎ বুঝতে হবে:

- ✓ সংবাদমাধ্যমের চরিত্র
- ✓ সাংবাদিকের বাধ্যবাধকতাগুলো; তাঁর পেশাগত দাবি, চাহিদা এবং কাজের প্রক্রিয়া ও গতি-প্রকৃতি
- ✓ সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকের সীমাবদ্ধতাগুলো

অর্থাৎ এ বইয়ের প্রথম অংশে সাংবাদিকদের উদ্দেশে এসব বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে, সেগুলো আদিবাসী প্রতিনিধিদেরও তলিয়ে ভাবতে হবে। সেই অনুযায়ী দূরত্ব তথা ঘাটতি এবং সমস্যাগুলো দূর করার সঠিক উপায়

ও কৌশল ঠিক করতে হবে। পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস এবং সহায়তার ভিত্তি তৈরি করা জরুরি। সুচিন্তিত তৎপরতা চাই।

মোটাদাগে দরকার:

- ✓ নিজের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির জায়গায় কিছু মৌলিক বোঝাপড়া
- ✓ সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন পর্যায়ে আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি করা
- ✓ সাংবাদিককে ভালো ও জরুরি প্রতিবেদনের হদিস দেওয়া এবং সেগুলো করতে তাঁকে প্রয়োজনীয় সহায়তা জোগানো
- ✓ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগের গোছালো এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা
- ✓ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এবং নিজেদের বক্তব্য নিজেদের মতো করে লিখে প্রকাশের লক্ষ্যে কার্যকর দক্ষতা ও কৌশল অর্জন
- ✓ কার্যকর সংবাদ সম্মেলন করার কৌশল

একে একে বিষয়গুলো ধরে কিছু চুম্বক পরামর্শ গুছিয়ে তোলার চেষ্টা করব।

২

বোঝাপড়া, সম্পর্ক গড়া

দূরত্ব দূর করার কাজ শুরু হতে হয় নিজের মনের মধ্যে। কিছু বিষয় বোঝাপড়া করা দরকার। তার ভিত্তিতে নিজের প্রত্যাশা ও করণীয়র মৌলিক গণ্ডি চিহ্নিত করতে হবে।

- **মনোভাব:** আদিবাসী প্রতিনিধিদের মনে মূলধারার সাংবাদিক বা সংবাদমাধ্যম সম্পর্কে ঢালাও নেতিবাচক ছাঁচে-ঢালা ধারণা অর্থাৎ স্টেরিওটাইপজাত চিন্তাভাবনা বা প্রেজুডিস থাকতে পারে। এ থেকে আসে অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং হাল ছেড়ে দেওয়ার মনোভাব। বিরূপ কোনো কিছু ঘটলে, মতপার্থক্য দেখা দিলে, চট করে মনে হতে পারে– 'ওরা সব সময় এমনই করবে।' এভাবে অনাস্থা পারস্পরিক দূরত্ব বাড়ায়। পরস্পরকে সঠিক বোঝা ও আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি করা জরুরি।
- **'আদিবাসী' বনাম 'উপজাতি':** ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকাংশ মানুষ সংবাদমাধ্যমে 'আদিবাসী' হিসেবে চিহ্নিত হতে চান। সাংবাদিকের করণীয় আলোচনার সময় এ প্রসঙ্গে চলতি বিতর্কগুলো এবং গ্রহণযোগ্য সমাধান খোঁজা হয়েছে। আদিবাসী প্রতিনিধিদেরও সেখানে উপস্থাপিত যুক্তিগুলো বিচার-বিবেচনা করতে হবে।
- **সেতুবন্ধ ভালো সাংবাদিকতায়:** বুঝতে হবে যে, সংবাদমাধ্যম বা সাংবাদিক ভালো প্রতিবেদন এবং ভালো সাংবাদিকতার বেশি কিছু করতে পারবেন না। এর বাইরে কিছু প্রত্যাশা করা যাবে না। সাংবাদিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার হলে তাঁর কাছেও এর বাইরে প্রত্যাশা করা যাবে না। করার দরকারও হবে

না। নৈতিক ও ভালো সাংবাদিকতার মধ্য দিয়েই কিন্তু সংবাদমাধ্যমের কাছে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার দাবিগুলো পূরণ হতে পারবে। অর্থাৎ এটাকে উভয়ের সাধারণ লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিনিধিরা সাংবাদিককে এটা করতে সাহায্য করবেন।

- **সাংবাদিকের অবশ্যকরণীয়গুলোকে শ্রদ্ধা:** এ বইয়ে আগের অংশে আমরা সাংবাদিকের জন্য সত্যনিষ্ঠতা, পক্ষপাতশূন্যতা বা ন্যায্যতা নিশ্চিত করার মতো কিছু অবশ্যকরণীয় নিয়ে আলোচনা করেছি। সেগুলো নিশ্চিত করা না গেলে ভালো সাংবাদিকতা তথা ভালো প্রতিবেদন হবে না। সাংবাদিকের এই পেশাগত চাহিদা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিনিধিদের বুঝতে ও মানতে হবে।
- **মূল স্রোতে আসা চাই:** আপনার লক্ষ্য হোক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার খবরাখবরকে ভালো সাংবাদিকতার মূল প্রবাহে অন্তর্ভুক্ত করা। পৃষ্ঠপোষকতামূলক বা সংরক্ষণবাদী (পেট্রোনাইজ করা, কনসেশন দেওয়া বা প্রোটেকটিভ) সাংবাদিকতা চাইবেন না। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার খবর 'কোটা'র মতো খোপে আটকা পড়লে তার দাম কমে যাবে।
- **অন্যান্য দাবিদার:** নৈতিক সাংবাদিকতা দাবি করে, সাংবাদিক সমাজের সব অংশের কথা বলবে এবং দুর্বল ও সুযোগবঞ্চিত সবাই সংবাদমাধ্যমের বিশেষ মনোযোগ পাবে। সংবাদমাধ্যমে অন্যান্য সংখ্যালঘু ও সুযোগবঞ্চিত গোষ্ঠী বা মানুষজনের খবরাখবর প্রতিফলনেও কমবেশি ঘাটতি আছে। অর্থাৎ শুধু ক্ষুদ্র জাতিসত্তারাই সাংবাদিকের বিশেষ মনোযোগের দাবিদার নয়। সংবাদমাধ্যমের সীমিত পরিসরে সুযোগবঞ্চিত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কথাও ঠাঁই পেতে হবে। সুতরাং নিজেদের জন্য একক মনোযোগ প্রত্যাশা করলে চলবে না।

জাতিগত বিভাজন-বিদ্বেষ

ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘাত-সংঘর্ষ বা তাদের প্রতি সহিংসতা অনেক সময়ই আদিবাসী-বাঙালি চরিত্র পায় অর্থাৎ একটা জাতিগত চেহারা নেয়। কিন্তু এ সংঘাত বা দ্বন্দ্ব আসলে স্বার্থের, প্রবল কোনো পক্ষের বা ক্ষমতাকেন্দ্রের স্বার্থের। এ বইয়ের আগের অংশে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ছিল। সতর্ক থাকুন, আদিবাসী স্বার্থের দিক দেখতে গিয়ে আপনার চিন্তাভাবনা যেন জাতিগত বিভাজন বা পক্ষপাতের ফাঁদে পড়ে না যায়।

চুম্বক পরামর্শ

মন তৈরি করা

১. সাংবাদিক এবং সংখ্যাগুরুর ধারা সম্পর্কে নিজের মনে ঢালাও, বদ্ধমূল পূর্বসংস্কার থাকলে সেগুলো স্পষ্ট চিনে নিয়ে কাটিয়ে উঠতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং পরিস্থিতি আলাদা। প্রতি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতা থাকে। পরস্পরের সমস্যাগুলো খোলা আলোচনা করে বোঝাপড়া জরুরি।

২. সন্দেহ ও অবিশ্বাস মনে নিয়ে সম্পর্ক গড়া শুরু করবেন না। সাধারণভাবে সাংবাদিকতার আদর্শ ভূমিকা ও সদুদ্দেশ্যের সম্ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা রাখবেন। আপনার সৌজন্য, সৌহার্দ্য ও বিনয় সুসম্পর্কের সুর বেঁধে দিক।

৩. সংবাদমাধ্যমের চরিত্র ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তি-সাংবাদিকের বাধ্যবাধকতাগুলো সংবেদনশীলভাবে বিচার করবেন। দায় পত্রিকা বা সংবাদমাধ্যমের নেতিবাচক নীতিমালার হলে আপনার এলাকার সাংবাদিককে দোষী সাব্যস্ত করবেন না; বরং তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মোকাবিলার কৌশল খুঁজবেন।

৪. সাংবাদিককে নিজের নিরাপত্তা দেখতে হবে। এটা আপনাকেও বুঝতে হবে। তাঁর কাছে অযৌক্তিক বীরত্ব প্রত্যাশা করবেন না। সংঘাত-সংঘর্ষ বা প্রবল কোনো পক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্বের খবরে এমন বুঝ-বিবেচনা বিশেষ জরুরি হবে।

৫. ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যেও সুযোগের বঞ্চনায় বেশকম আছে। বেশকম আছে সংবাদমাধ্যমে তাদের প্রতিফলনের বঞ্চনায়। যারা যত বঞ্চিত, তাদের তত অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা দরকার। আপনাকেও তাদের কথা তুলে ধরতে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। যেমন, ক্ষুদ্রতর জাতিসত্তা বা সমতলের আদিবাসীদের কথা জানাতে আপনি বিশেষ যত্নবান হবেন।

সাংবাদিকতা বোঝা

১. সাংবাদিককে তাঁর মতো করে কাজ করার অবকাশ দিতে হবে। তাঁর পক্ষপাতশূন্য, ন্যায্য ও দায়িত্বশীল থাকার পেশাগত দাবি বুঝতে হবে। আপনার তরফ থেকে তথ্য দেওয়ার মধ্যে অনেক সময় হয়তো অলিখিত প্রত্যাশা থাকে যে, সাংবাদিক পুরোপুরি আপনাদের মতো করে লিখবেন, অন্য পক্ষের কথা শুনবেন না। এমন প্রত্যাশাও কিন্তু দূরত্বের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সাংবাদিকের কাজ ভালো প্রতিবেদন করা, আন্দোলনে শরিক হওয়া না।

২. আপনাকে বুঝতে হবে যে, সাংবাদিক পক্ষপাত না করে স্বতন্ত্র অবস্থান নিলে এবং সব পক্ষের সঙ্গে কথা বললেই ভালো প্রতিবেদন হবে। এতে যদি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কোনো অংশ বা কাজ সম্পর্কে ন্যায্য সমালোচনা আসে, যথার্থ নেতিবাচক কোনো দিক উঠে আসে, তাতে ক্ষুব্ধ হবেন না।

৩. দায়িত্বশীল হবেন। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো বিষয় স্পর্শকাতর। আপনার কথাবার্তা যেন উসকানিমূলক হয়ে বৃহত্তর সমস্যা ডেকে না আনে। জাতিগত বিভাজন বা বিভেদ উসকে দেওয়ার মতো কথাবার্তা বলবেন না। সেটা সত্যনিষ্ঠ হবে না, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আপনার দূরত্বও বাড়াবে।

৪. ঢালাও বা মিথ্যা অভিযোগ করবেন না বা তেমন কথাবার্তা বলবেন না। সাংবাদিক সেটা গ্রহণ করতে পারবেন না। আপনার ওপর থেকে তাঁর আস্থাও চলে যাবে।

আবেদন করা, বোঝানো

১. সাংবাদিকের নৈতিকতার দাবি সুযোগ-সুবিধায় পিছিয়ে পড়া অথবা অন্যায়-অন্যায্যতার শিকার মানুষদের প্রতি বাড়তি মনোযোগ দেওয়া। এই যুক্তি তুলে ধরে সংবাদমাধ্যম তথা সাংবাদিকের নৈতিকতার কাছে আবেদন করুন। শুধু 'নিজেদের খবর' হিসেবে প্রতিফলন দাবি করবেন না।

২. সম্পাদক ও অন্যান্য সিদ্ধান্তগ্রহীতা বা গেটকিপার, এমনকি মালিকের সঙ্গেও নিয়মিত মতামত-তথ্য বিনিময় করা জরুরি। তাঁদের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বাস্তবতা বোঝাতে হবে। এভাবে হয়তো কারও নেতিবাচক নীতিতে বদল আনতে পারবেন।

সম্পর্ক তৈরি করা

১. জাতীয় সংবাদমাধ্যম এবং ওপরের পর্যায়ে যেমন যোগাযোগ রাখবেন, তেমনি স্থানীয় পত্রিকা বা জাতীয় পত্রিকার স্থানীয় সাংবাদিককেও অবহেলা করবেন না। তাঁর সঙ্গেই কিন্তু আপনার প্রত্যক্ষ লেনদেন সবচেয়ে বেশি হবে।

২. সাংবাদিকের সঙ্গে কেবল সমস্যা-সংকটের সময় যোগাযোগ করবেন না। সামাজিক যোগাযোগের সুযোগ খুঁজবেন। সব ধাপের সাংবাদিকদের সামাজিক উৎসব ও অনুষ্ঠানে; ওয়ানগালা, বিজু বা রাস উৎসবে, বিয়ে-শাদিতে আমন্ত্রণ করুন। অনানুষ্ঠানিক আড্ডা-বৈঠকে একত্র হোন। তাঁদের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবন ও বাস্তবতা দেখান।

৩. সাংবাদিকের দুঃসময়ে তাঁর পাশে দাঁড়ান। সমবেদনা জানান, যথাসাধ্য সাহায্য করুন। তাঁর কোনো পেশাগত বিপর্যয়ে যেমন, তেমনি ব্যক্তিগত দুর্যোগের সময়ও সমব্যথী হোন।

সম্পর্ক রাখা

১. সংবাদমাধ্যমে ভুল, নেতিবাচক বা আপত্তিকর কোনো কিছু প্রকাশিত হলে আপনি অবশ্যই প্রতিবাদ পাঠাবেন। তবে প্রতিবাদের ভাষায় ও সুরে সংযত ও পেশাদার থাকবেন। রাগারাগি বা ব্যক্তিগত আক্রমণ কখনোই করবেন না। কোনো জরুরি খবর প্রকাশ না হলে সাংবাদিককে আপনার আন্তরিক দুঃখ জানান, এর ফলে কার কী ক্ষতি হলো তা জানান। তাতে প্রতিবেদক-সম্পাদক নিজে অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন এবং পরেরবার এ কথা তাঁদের মনে থাকবে।

২. পেশাদার ও বুঝদার হবেন। অযৌক্তিক মনোযোগ দাবি করবেন না। সাংবাদিক সব সময় ব্যস্ততা ও চাপের মধ্যে কাজ করেন। অহেতুক তাঁর সময় নষ্ট করবেন না। দুপুরের পর তাঁর হয়তো ফোনে আলাপ করারও সময় থাকে না। তেমন সময় যোগাযোগ করতে হলে নিতান্ত দরকারি কথাটুকুই বলবেন; খোশগল্প বা লম্বা আলাপ জুড়বেন না।

৩. কোনো ভালো প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে অথবা সংবাদমাধ্যম কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক ও সম্পাদকদের যথাযোগ্য প্রশংসা করতে ও ধন্যবাদ জানাতে কখনোই দেরি করবেন না। স্বীকৃতি দেওয়া ও ধন্যবাদ জানানো স্বতঃস্ফূর্ত হোক। সাংবাদিক অনাকাঙ্ক্ষিত বা অন্যায্য কিছু করলে তাঁকে দুঃখ জানিয়ে সেটা বলুন। এতে তিনি লজ্জিত হবেন এবং সচেতন হবেন।

ধৈর্য এবং ধৈর্য

১. ধৈর্য ও লেগে থাকা একান্ত দরকার। তবে অযৌক্তিকভাবে নাছোড়বান্দা হবেন না। এমন যেন না হয় যে, আপনার ফোন পেলে বা ছায়া দেখলেই সাংবাদিক বিরক্ত হন, পালানোর সুযোগ খোঁজেন। কারও বা কোনো ক্ষেত্রে আর চেষ্টা নিষ্ফল বুঝলে ক্ষান্ত দিন। আগ্রহী সাংবাদিকের খোঁজ করুন। নতুন বিষয়ে নতুন করে চেষ্টা করুন।

২. সব সময় মনে রাখুন, আপনার বিবেচনায় জরুরি সব কটি ঘটনা বা বিষয়ই যে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হবে, তা নয়। সাংবাদিক নিজের মাপকাঠিতে সংবাদমূল্য বিচার করবেন। বরং তাঁকে ভালো খবর পেতে সাহায্য করুন। তা হলে তিনি আপনাকে 'তদবিরকারী' হিসেবে না দেখে উপকারী সূত্র হিসেবে দেখবেন। আপনার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আগ্রহ বাড়বে।

৩

সাংবাদিকের চোখ দিয়ে দেখা, দেখানো

নিজস্ব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমে প্রচার চাওয়ার সময় যেকোনো সংস্থা-প্রতিষ্ঠানকেই নিজের ঢাক মাত্রাতিরিক্ত না পেটাতে সতর্ক থাকতে হয়। ভালো সাংবাদিকতা কাউকে নিছক আত্মপ্রচারের সুযোগ দিতে চায় না। সুতরাং কেবল সংস্থা বা প্রকল্পের খবর নিয়ে সাংবাদিকের দ্বারস্থ হবেন না। তা ছাড়া, আপনি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার স্বার্থ-সংরক্ষণে কাজ করছেন। সে সম্পর্কে জরুরি যেকোনো খবরাখবর প্রকাশই আপনার মূল লক্ষ্য। সুতরাং নিজের এনজিও, সিবিও বা সংগঠনের ক্ষুদ্র স্বার্থ ছাপিয়ে ওঠা আপনার বৃহত্তর দায়িত্বের মধ্যে পড়বে। এ মনোভাব নিয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আপনি বেশি গুরুত্ব পাবেন। কেননা সাংবাদিক তখন আপনার মাধ্যমে ভালো খবরের হদিস পাবেন বলে ভাববেন।

সংবাদমূল্য কী: সাংবাদিকের এ প্রত্যাশা পূরণ করতে হলে আপনাকে বুঝতে হবে, সাংবাদিকের কাছে খবর কী, ঘটনার সংবাদমূল্য কোথায়। সংবাদমূল্য আসলে স্থির হয় পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের চাহিদার সূত্র ধরে। সচরাচর কয়েকটি মাপকাঠিতে কোনো ঘটনা বা বিষয়ের সংবাদমূল্য বিচার করা যেতে পারে:

- *সময়োপযোগিতা:* মানুষ সর্বশেষ পরিস্থিতির কথা জানতে চায়, তাই সাংবাদিক খোঁজেন টাটকা নতুন ঘটনা। বাসি হয়ে গেলে খবরের দাম কমে যাবে। তবে ফিচার, নিবন্ধ বা বিশেষ প্রতিবেদনের জন্য দিনাদিন তাৎক্ষণিকতা না থাকলেও চলে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অনেক বিষয়ই এ ধরনের লেখার আওতায় আসবে। কিছু খবর আবার পুরোনো হয়ে গেলে তার দাম থাকবে না।

- *ফলাফল ও তাৎপর্য:* জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো ঘটনার তাৎপর্য থাকলে সেটা খবর হবে। মানুষের ওপর কোনো ঘটনা বা বিষয়ের প্রভাবের মাত্রা সংবাদমূল্য নির্ধারণের বড় মাপকাঠি। ঘটনার ফলাফল তাই খবরের বিষয় হয়। আবার, ঘটনার প্রভাব পড়তে পারে ভবিষ্যতের ওপর। যে ঘটনা যত বেশি মানুষকে

প্রভাবিত করে, তার দাম তত বাড়ে। একজন বা ছোট জনগোষ্ঠীর ওপর অন্যায়-অন্যায্যতার খবরেরও দাম অনেক। ভবিষ্যতে এর বৃহত্তর প্রভাব থাকতে পারে।

- *নাম-পরিচিতি:* ঘটনায় কোনো সুপরিচিত মানুষজন জড়িত থাকলে খবরের দাম বাড়বে। বড় কোনো নেতা-প্রতিনিধি, উচ্চ পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তা, বিখ্যাত মানুষজন, বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি যখন আদিবাসীদের সমস্যা-সংকট অথবা তাদের জন্য জরুরি কোনো বিষয়ে কথাবার্তা বলবেন, সেটা সহজে খবর হবে। সংবাদমূল্য বিচারের মাপকাঠিতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের মধ্য থেকেও বড় ও পরিচিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীরা তুলনামূলক বেশি গুরুত্ব পায়, ছোট বা সাধারণেরা বেশি উপেক্ষিত হয়।

- *ঘটনার নৈকট্য:* স্থানীয় ঘটনা মানুষকে সরাসরি প্রভাবিত করে, আগ্রহী করে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসংক্রান্ত অপেক্ষাকৃত ছোট খবর হয়তো শুধু আঞ্চলিক পত্রিকাতেই গুরুত্ব পাবে। আবার, কিছু বিষয়ের সঙ্গে মানুষ মানসিকভাবে নৈকট্য বোধ করে। যেমন, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে রাষ্ট্রের সঙ্গে আদিবাসীদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের খবরে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তারসহ অনেক মানুষের আগ্রহ-কৌতূহল থাকবে।

- *দ্বন্দ্ব-সংঘাত-চাঞ্চল্য:* যে ঘটনায় কোনো দ্বন্দ্ব, তর্ক-বিতর্ক বা ঘাত-প্রতিঘাত থাকে, মানুষ স্বভাবতই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমন ঘটনার ফলাফল, তাৎপর্য বা প্রভাবও জনজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।

- *অভিনবত্ব:* ঘটনায় যদি নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য থাকে, সেটা যদি গড়পড়তা ঘটনার চেয়ে চোখে পড়ার মতো ভিন্ন বা আলাদা হয়, বেশির ভাগ মানুষ সেটা জানতে আগ্রহ বোধ করবে।

- *চলতি আগ্রহ:* একেক সময়ে একেক বিষয়ে সমাজে মানুষের আগ্রহ তৈরি হয়। তখন সংবাদমাধ্যমও সে বিষয়ের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। পুরোনো বা চিরকালীন কোনো ঘটনা বা বিষয় তখন সংবাদমাধ্যমের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে। যেমন, দারিদ্র্য অনেক মানুষের রোজকার বাস্তবতা। সাধারণভাবে সব সময় এর প্রতি আলাদা নজর পড়ে না। কিন্তু কোনো ঘটনা বা কার্যক্রম-কর্মসূচির সুবাদে কোনো কোনো সময় দারিদ্র্য সমাজের ব্যাপক আলোচনা-বিতর্কে উঠে আসতে পারে। তখন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার দারিদ্র্যের বিষয়েরও আলাদা গুরুত্ব পাওয়া সম্ভব।

- *জানানোর প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব:* সাংবাদিক নিজে কোনো বিষয় জনগোষ্ঠীকে জানানো দরকার বলে মনে করতে পারেন। ঘটনা বা বিষয়টি হয়তো সাধারণভাবে কারও নজরে পড়ছে না, কম লোকই তার কথা জানে, কিন্তু সাংবাদিক তার খোঁজ পেয়েছেন। তিনি তখন সে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরতে পারেন।

- *মানুষের রোজকার জীবনযাপনের চিত্র:* সাধারণ মানুষের রোজকার জীবনের সংগ্রাম-সমস্যা-সাফল্যের খবরে অনেক মানুষের আগ্রহ থাকে। এটাকে সব সময় সংবাদমাধ্যম গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু খবর হিসেবে এর গ্রহণযোগ্যতা অনেক হবে।

- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার খবরাখবরের প্রেক্ষাপটে ওপরে বলা সংবাদমূল্য তালিকার শেষের তিনটি মনে রাখা আপনার জন্য বিশেষ জরুরি। এগুলোর সূত্র ধরে আপনি জরুরি অনেক খবর চিহ্নিত করার সুযোগ পাবেন।

চুম্বক পরামর্শ

১. দিনাদিন কোনো বড় ঘটনা ঘটলে সাংবাদিককে দ্রুত সেটা জানাবেন। আপনার কাছ থেকে হদিস পেয়ে খবরটি জানানোতে এগিয়ে থাকতে পারলে সাংবাদিক আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন।

২. পত্রিকা বা রেডিও-টিভির বুলেটিনের লেখা গ্রহণ করার শেষ সময় বা ডেডলাইন থাকে। ডেডলাইনের যথাসম্ভব আগে খবর পৌঁছানো দরকার। দিনের ঘটনার খবর তার আগে না পৌঁছালে সেদিন প্রকাশের সুযোগ থাকবে না, পরদিন খবর হয়তো বাসি হয়ে যাবে।

৩. বড় না হলে অবশ্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তা-সংক্রান্ত দিনের ঘটনা খবর না-ও হতে পারে। বা হলেও তুলনামূলক বিচারে সেগুলো হয়তো জাতীয় দৈনিকের ভেতরের পাতায় বা খবরের অপেক্ষাকৃত গৌণ অংশে চলে যাবে। এসব খবর বরং স্থানীয় পত্রপত্রিকায় বেশি দাম পাবে। এখন অনলাইনের যুগে সে ডেডলাইন নেই, কিন্তু আরও দ্রুত খবর পৌঁছানোর তাগিদ আছে।

৪. তবে রোজকার খুঁটিনাটি খবর প্রকাশিত হওয়াকে আপনার লক্ষ্য করবেন না। সাধারণভাবে দৈনিক পত্রিকার প্রথম বা শেষ পাতায়, টিভির বুলেটিনের প্রথম দিকে অথবা ওয়েবসাইটে নীড়পাতায় লম্বা সময় ধরে স্থান পাওয়ার জন্য আপনি জরুরি বিষয়গুলোতে গভীরতাধর্মী বড় ও বিশেষ প্রতিবেদনের সুযোগ চিহ্নিত করবেন।

   - ✓ সাংবাদিককে গভীরে তলিয়ে খবর করার মতো বিষয়ের হদিস দিন। সংবাদমূল্যগুলো বিচার করে আপনি সাংবাদিককে এমন খবরের মূল বিষয়বস্তুর ধারণা দিতে পারেন।
   - ✓ আপনি চাইবেন, খবরগুলো প্রকাশে সাংবাদিক যেন নিজের ভেতর থেকে তাগিদ বোধ করেন। সে রকম ভালো ও বড় খবর অনুসন্ধানে তাঁকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করুন।
   - ✓ আপনি যে ঘটনা বা বিষয়ে সাংবাদিকের মনোযোগ চাইছেন, তার অভিনব বা নতুন দিকগুলো চিহ্নিত করুন। সাংবাদিককে সেটা দেখিয়ে দিন।
   - ✓ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য এসব বিষয়ের ফলাফল ও তাৎপর্য বুঝতে তাঁকে সাহায্য করুন।

৫. আদিবাসীদের জন্য জরুরি বিষয়গুলো এবং তাদের সমস্যা-বঞ্চনা কীভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনকেও প্রভাবিত করতে পারে, সেদিকে সাংবাদিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। যেমন, প্রাকৃতিক বনের জায়গায় বাণিজ্যিক বনায়ন আদিবাসীদের জীবন-জীবিকার ক্ষতি করে। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে এটা পরিবেশ ও পুরো জনগোষ্ঠীর জন্যই ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। এভাবে ঘটনা বা বিষয়ের বৃহত্তর প্রভাব-ফলাফলগুলো চিহ্নিত করুন।

৬. উপযুক্ত উপলক্ষের খোঁজে থাকুন। সমাজে চলতি আগ্রহের দিকে নজর রাখুন। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য জরুরি কোন বিষয়গুলো সেই আঙ্গিকে খাপ খায়, তা ভাবুন। বিশেষ দিবসগুলো লক্ষ্য করে প্রাসঙ্গিক ভালো প্রতিবেদন করার সুযোগ সম্পর্কে আগে থাকতে সাংবাদিকদের জানান।

৭. সংবাদমাধ্যমে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বিষয়ে সচরাচর দুই ধরনের খবর বেশি আসে, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংস্কৃতি-জীবনধারা। এগুলো কিন্তু খুবই বড় ও জরুরি বিষয়, তবে সব সময় সঠিকভাবে বা যথাযথ তাৎপর্যসহ উঠে আসে না। এসব ক্ষেত্রে খবরে গুণগত পরিবর্তন আনার উপায় ভাববেন। সাংবাদিককে সেই পথ দেখাবেন।

- ✓ ক্ষুদ্র জাতিসত্তা-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতমূলক ঘটনার গভীরে গিয়ে সত্যানুগ ও দায়িত্বশীল প্রতিবেদন করতে সাংবাদিককে সাহায্য করুন।
- ✓ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের রোজকার জীবনযাপনের নতুনত্ব, বৈচিত্র্য, সংগ্রাম-সমস্যা-দ্বন্দ্বগুলোর সঙ্গে সাংবাদিককে পরিচিত করান। গভীরে গিয়ে বোঝার সুযোগ করে দিন।
- ✓ সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও নতুনত্বের পাশাপাশি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবনে এর গুরুত্ব, এ ক্ষেত্রে নতুন-পুরোনোয় দ্বন্দ্ব, হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি ও ক্ষতি– এসব তাঁকে বুঝিয়ে বলুন। এক ভাষা নিয়েই অনেক জরুরি এবং আগ্রহব্যঞ্জক খবরের সুযোগ আছে।

৮. যখন সমাজের ব্যাপকসংখ্যক মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করার মতো বড় কোনো ঘটনা ঘটে এবং চলমান থাকে, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মতো বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি মনোযোগ স্বভাবতই কমে যায়। এ রকম কোনো সময়ে যদি আদিবাসীদের জন্য বিশেষ জরুরি কোনো ঘটনা ঘটতে থাকে, সেটা সাংবাদিকের নজরে আনতে আপনার বাড়তি চেষ্টা দরকার হবে। সংবাদমূল্যগুলো বুঝে কৌশল ঠিক করতে হবে।

৯. সাংবাদিককে কেবল সমস্যার খবরের হদিস দেবেন না। শুধু সমস্যা-বঞ্চনার খবরে একটা বিরূপ চিত্র তৈরি হয়, গৎবাঁধা স্টেরিওটাইপ চলে আসে। সমস্যা-বঞ্চনা যেহেতু অনুপাতে বড়, সেগুলো অগ্রাধিকার অবশ্যই পাবে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সম্পর্কে ইতিবাচক খবরাখবরের দিকেও সাংবাদিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। কোনো জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তির বিশেষ কোনো অর্জন এবং যেকোনো বিষয়ে সংগ্রাম ও বিজয়ের খবর চিহ্নিত করবেন। খারাপ খবরের ভিড়ের মধ্যে এসব বিষয়ের খবর সংবাদমাধ্যম এবং পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের আলাদা মনোযোগ পায়।

১০. সম্ভাব্য প্রতিবেদন বা জরুরি বিষয় নিয়ে আলাপ করার জন্য সাংবাদিকের কাছে সুবিধাজনক সময় চেয়ে নেবেন। তবে মামুলি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে তাঁকে অস্থির করবেন না। বাড়তি কথা বলবেন না। কোনো সাংবাদিক আগ্রহী না হলে তাঁর এবং আপনার সময় নষ্ট না করে আগ্রহীজনকে খুঁজে নিন।

৪

সাংবাদিককে তাঁর কাজে সহায়তা করা

আদিবাসী প্রতিনিধিদের একটি বড় অভিযোগ, সংবাদমাধ্যম ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সম্পর্কে কিছু ছাঁচে-ঢালা ধারণা ও চিত্র তুলে ধরে। এটা কিন্তু অনেক সময় না-জানা থেকে হয়। সাংবাদিকের না-জানা ও না-বোঝার জায়গাগুলোয় আপনি গুণগত পরিবর্তন আনতে পারেন।

অন্যদিকে, সাংবাদিকের দরকার তথ্য। আপনি সে তথ্য পেতে সাহায্য করলে তিনি আপনাকে মনে করে রাখবেন; সুসম্পর্কের ভিত্তি মজবুত হবে। এটা ঠিক যে, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট অনেক ঘটনার বিষয়ে কেউই মুখ খুলতে চায় না। স্পর্শকাতর এসব বিষয়ে রাষ্ট্রসহ অনেক প্রবল প্রতিপক্ষকে চটানোর ঝুঁকি থাকে। কিন্তু ভুক্তভোগী বা সাধারণ মানুষের জন্য এ ঝুঁকি অনেক বেশি। পক্ষান্তরে জাতিসত্তার নেতৃত্ব বা সিবিও, এনজিও ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা কিছু কথাবার্তা বলতে পারেন। সে সাহসটুকু করতে হবে। এ ছাড়া তথ্য-প্রমাণ জুগিয়ে পরোক্ষভাবে সহায়তা তো তাঁরা করতেই পারেন।

চুম্বক পরামর্শ

১. সাংবাদিকদের তথ্য দেওয়ার সুবিধার্থে সব সময়ের জন্য সাধারণভাবে কিছু করণীয়:

- যেসব জাতিসত্তা নিয়ে কাজ করছেন, তাদের সম্পর্কে তথ্যকণিকা তৈরি রাখুন।
- বড় ঘটনাপঞ্জি ও ব্যক্তিত্বের জীবনবৃত্তান্ত তৈরি রাখুন। ছবি রাখুন।
- আদিবাসী-সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইনকানুনগুলোর সারসংক্ষেপ করে রাখুন।
- প্রধান সমস্যাগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা, প্রেক্ষাপটসহ তথ্যকণিকা তৈরি করে রাখুন।
- সমাজ-সংস্কৃতির বড় অনুষ্ঠানগুলোর তালিকা, ছবিসহ বিবরণ তৈরি রাখুন।
- সম্ভব হলে এসবের মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা রাখুন। ছবিসহ ব্রোশিওর ছাপান।
- নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকলে সেটায় নিয়মিত তথ্য দিন এবং হালনাগাদ করুন।
- আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীদের প্রভাবিত করে, এমন যেকোনো সরকারি নীতি-সিদ্ধান্তের নথিপত্র সংগ্রহে রাখবেন। এমন যাবতীয় নোটিশ, চিঠিপত্র বা সভার কার্যবিবরণী ফাইলে থাকা চাই।
- একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলোর ফাইল রাখুন।

- আপনার সংস্থা বা সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরির সময় সাংবাদিকের তথ্য এবং বিভিন্ন বিষয়ে জবাবদিহির চাহিদা মনে রাখুন। পরিচ্ছন্ন, গোছানো, তথ্যসমৃদ্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন সাংবাদিককে ধারাবাহিক ও হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত দিতে পারে।
- গবেষণা, জরিপ বা কোনো বিশেষ উদ্যোগের পুস্তিকা প্রকাশ করতে চেষ্টা করবেন।
- সংস্থা বা সংগঠনের নিজস্ব প্রকাশনা বা নিউজলেটার প্রকাশের চেষ্টা করুন।
- সময় সময় সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ আয়োজন বা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করুন। এসব অনুষ্ঠানে কিছু সত্যিকার তথ্য-মতামত বিনিময়ের কথা ভাবুন। গোলটেবিল আলোচনা একটি ভালো উপায়। এমন উপলক্ষ সংবাদমাধ্যমে স্থান পাওয়ার ভালো সুযোগ।
- বড় কোনো অনুষ্ঠান-আয়োজনের আগে থেকে সাংবাদিককে বিষয়টির নানা দিক সম্পর্কে জানাতে থাকবেন। এতে তাঁর আগ্রহ বাড়বে, তিনি বিষয় ভালো করে বুঝতেও পারবেন। গুছিয়ে প্রেস-কিট তৈরি করবেন। সাংবাদিককে আগাম কাগজপত্র ও তথ্য পাঠাবেন।
- আপনার সংস্থা বা সংগঠনে সাংবাদিককে তথ্য জানানোর জন্য একাধিক মুখপাত্র রাখবেন। প্রয়োজনে সাংবাদিক যেন যেকোনো সময় অন্তত একজনকে যোগাযোগ করতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করবেন।
- এঁদেরসহ ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের নিয়ে কর্মরত মানুষজন, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, সমমনা সংস্থা-প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানা, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা সাংবাদিককে দিন। সম্ভব হলে ছোটখাটো নির্দেশিকা ছাপিয়ে ফেলতে পারেন। এগুলো নিজেদেরও কাজে আসবে।

২. সাংবাদিকের তথ্যসংক্রান্ত চাহিদা মেটানোর জন্য কিছু জরুরি সাধারণ বিবেচনা ও করণীয়:

- সাংবাদিক যখন আপনার কাছে কোনো তথ্য চাইবেন, আগে তৈরি হয়ে নেবেন। তাঁর তাড়াহুড়ো থাকলেও একটু সময় চেয়ে তথ্যগুলো গুছিয়ে নেবেন।
- কোনো কিছু জানা না থাকলে সেটা অকপটে স্বীকার করবেন। তথ্য দেওয়ায় কোনো সমস্যা বা বাধা থাকলে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলবেন। কখনোই সটান বলবেন না যে, 'মন্তব্য নেই।' এ থেকে সাংবাদিক সন্দেহ করতে পারেন, আপনি কিছু গোপন করতে বা এড়িয়ে যেতে চাইছেন।
- ভুল বা মিথ্যা তথ্য দেবেন না। প্রকাশের আগে বা পরে সেটা যখন ধরা পড়বে, আপনার ওপর থেকে সাংবাদিকের আস্থা চলে যাবে। তা ছাড়া, সত্য প্রকাশ পাবেই। তখন মানুষ ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সম্পর্কে যেকোনো খবরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করবে।
- সাংবাদিকের চাই সূত্র-উৎস নির্দিষ্ট করা ছাঁকা তথ্য, প্রমাণ এবং যাচাইয়ের সুযোগ। তাঁকে আপনি তেমন তথ্য-প্রমাণ পেতে সাহায্য করবেন। কোথায় গেলে সেটা প্রত্যক্ষ দেখা যাবে বা তথ্য মিলবে, তা বাতলে দেবেন।
- নিরাপত্তার কারণে নাম প্রকাশ করতে আপত্তি থাকলে প্রামাণ্য নজির যেমন দেবেন, তেমনি অন্য আরও সূত্র নির্দেশ করবেন। সাংবাদিক তখন একাধিক সূত্রে যাচাই করতে পারবেন।

- জনগোষ্ঠীর সহায়তা ছাড়া ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বিষয়ে গভীরে তলিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন করা সম্ভব নয়। আপনি সে যোগাযোগগুলো ঘটিয়ে দিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন।
- ঘটনা বা প্রবণতার কার্যকারণ ও ফলাফল-তাৎপর্য বুঝতে সাংবাদিককে সাহায্য করুন; এটা করবেন তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে। যেকোনো ঘটনা বা বিষয়ের যথাযথ প্রেক্ষাপট জানাবেন। পরবর্তী ঘটনা বা ফলো-আপ জানাতে সজাগ থাকবেন।
- নিতান্ত তাড়াহুড়ো না থাকলে এবং ঘটনা বা বিষয় জটিল হলে টেলিফোনে তথ্য না দিয়ে সামনাসামনি আলাপ করতে চাইবেন।

৩. দিনের বড় ঘটনার ক্ষেত্রে সাংবাদিককে তথ্য পেতে বাড়তি সহযোগিতা করতে তৈরি থাকুন।

- দিনের ঘটনার ক্ষেত্রে সাংবাদিক চাইলেও সময় দিতে পারেন না। তিনি তখন চান চটজলদি গোছানো তথ্য ও বক্তব্য।
- হঠাৎ কোনো ঘটনা ঘটলে বক্তব্য-মন্তব্য-তথ্য দেওয়ার মতো ব্যক্তি বা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাংবাদিকের যোগাযোগের ব্যবস্থা গড়ে তুলুন।
- নিজের সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্রকে প্রস্তুত রাখুন। প্রেক্ষাপটের তথ্য, প্রয়োজনীয় তারিখ, সময়, ঘটনাস্থলগুলো গুছিয়ে লিখে ফেলুন।
- সাংবাদিকের জরুরি প্রয়োজনের সময় টেলিফোনে তাঁকে তথ্য দেবেন। তবে টেলিফোনে ভুল-বোঝাবুঝির ভয় থাকে। কথাগুলো গুছিয়ে নেবেন। সংক্ষেপে মূল এবং যাচাই করা তথ্য দেবেন।

৪. নিজের প্রয়োজনের সময় ছাড়াও সাংবাদিককে সাহায্য করুন। এলাকায় যেকোনো বড় ঘটনা ঘটলে সাংবাদিককে জানান। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বিষয়াদির বাইরেও তাঁকে খবরের ধারণা দিন। তথ্য জোগান। তিনি এ উপকার মনে রাখবেন। কখনো হয়তো আপনিও তাঁর কাছ থেকে কিছু ঘটনার আগাম তথ্য পাবেন।

বিশেষ অনুষ্ঠান

কোনো বিষয় বা সমস্যার দিকে সাংবাদিকের নজর টানতে চাইলে বিশেষ অনুষ্ঠান বা ইভেন্ট করা একটি কার্যকর জনসংযোগ পদ্ধতি। মেলা, আলোচনা, মতবিনিময়, কর্মশালা–ইত্যাদি ইভেন্ট পরিকল্পনার সময় সংবাদমূল্যগুলো মাথায় রাখবেন। আরও মনে রাখবেন: সাংবাদিক ভালো উদাহরণ ও তথ্য-প্রমাণ চাইবেন; ভালো ছবি-ভিডিও তোলার সুযোগ খুঁজবেন; গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-বক্তব্য দেওয়ার মতো মানুষজনকে হাতের কাছে চাইবেন। টিভি ও অনলাইন শেষের দুটি সুযোগ না থাকলে বিশেষ আগ্রহী হবে না। প্রাসঙ্গিক হলে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষজনকে উপস্থিত করবেন। সম্প্রদায়ের নেতা, বর্ষীয়ান মানুষজনকে একত্র করবেন। নারীদের প্রতিনিধিত্ব বিশেষ জরুরি হবে। এঁদের সঙ্গে সাংবাদিকদের কথা বলার ব্যবস্থা রাখবেন। সম্ভব হলে কোনো সংবাদমাধ্যমকে মিডিয়া-পার্টনার করুন।

৫

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগের পরিকল্পনা

আটঘাট বেঁধে এগোনো দরকার।

- আগামী এক বছরে কোন কোন বিষয় বা সমস্যা সংবাদমাধ্যমের প্রকাশের জন্য চেষ্টা করবেন, তার একটা তালিকা করুন। আপনার সংস্থা-সংগঠনের সদস্য এবং জনগোষ্ঠীর মানুষজনের সঙ্গে আলাপ করে তালিকাটি তৈরি করবেন।
- প্রতি চার মাসের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করুন।

সাধারণভাবে আপনাকে সংবাদমাধ্যমের ধরন বুঝে সেগুলোর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের উপায় ভাবতে হবে:

- দৈনিক পত্রিকা এবং সেগুলোরসহ প্রতিষ্ঠিত অনলাইন মাধ্যম সবচেয়ে জরুরি। বিশেষ করে পত্রিকার আছে স্থায়িত্ব ও গভীরে যাওয়ার সুযোগ। যেসব বিষয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বড় জায়গা দাবি করে সেগুলোর ক্ষেত্রে আপনি দৈনিক পত্রিকাসহ ছাপা-মাধ্যমের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হবেন। তবে দৈনিকগুলো সচরাচর গণপত্রিকা। বিশেষ জনগোষ্ঠীর বিষয়ে আলাদা গুরুত্ব বা নজর দিতে এদের অনীহা থাকে, সুযোগও কম থাকে। সাময়িকী বা বিশেষ আগ্রহের পত্রিকা হয়তো বেশি গুরুত্ব দেবে।
- টিভি বা রেডিও আপনি বাছবেন তাৎক্ষণিকতা এবং প্রাণবন্ত সজীব উপস্থাপনার তাগিদ থেকে। (অনলাইন সম্পর্কেও একই কথা।) ঘটনায় জোরালো ছবি দেখানোর সুযোগ থাকলে আপনি টিভিকে বিশেষ আগ্রহী করতে পারবেন। আকর্ষণীয় শব্দচিত্র ও বক্তব্য পাওয়ার সুযোগ থাকলে তাতে রেডিও বিশেষ আগ্রহী হবে। তবে বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া এদের খবরের গভীরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এদের (অনলাইন মাধ্যমকেও) আপনি তথ্যচিত্র বা ধারাবাহিক প্রতিবেদনের ধারণা দিতে সচেষ্ট থাকবেন। কিন্তু এরাও গণসংবাদমাধ্যম, দৈনিক পত্রিকার সীমাবদ্ধতাগুলো এদেরও থাকবে।

সংবাদমাধ্যমের ঝোঁক বিচার ও বাছাই: গণসংবাদমাধ্যমে সংখ্যালঘু অথবা সংখ্যাগুরুর চেয়ে ভিন্ন যেকোনো গোষ্ঠীর কথা কম আসে। প্রাতিষ্ঠানিক তথা সম্পাদকীয় সচেতন দৃঢ় নীতি-সিদ্ধান্ত না থাকলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মতো কোনো গোষ্ঠী সেখানে বিশেষ গুরুত্ব পায় না। আবার, মাধ্যমভেদেও নীতির বেশকম থাকে। কেউ হয়তো এ প্রশ্নে একেবারেই নেতিবাচক অবস্থান নেয়।

- আপনাকে উল্লেখযোগ্য সব কটি প্রতিষ্ঠানের চরিত্র ও নীতিগত অবস্থান বুঝতে হবে। বোঝার প্রথম উপায় হচ্ছে নিয়মিত বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ক্ষেত্র, পত্রিকা, টিভি, ও রেডিওর খবরগুলো দেখা, শোনা ও পড়া।

- ✓ লক্ষ করুন, বড় ঘটনা কে কীভাবে প্রকাশ করছে; কোন মাধ্যম কতখানি জায়গা দিচ্ছে, কোন পাতায় ছাপছে; কারা সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় ছাপছে বা টক শো করছে, সেগুলোর বক্তব্য কী।
- ✓ এ ছাড়া সম্পাদক পর্যায়ে কথা বললেও ধারণা পাবেন।

আপনার বোঝার ভিত্তিতে সংবাদমাধ্যমের শ্রেণিবিভাগ করে অগ্রাধিকার তালিকা ঠিক করুন। মনে রাখবেন, সব সংবাদমাধ্যম আদিবাসীদের জন্য জরুরি খবর ও সমস্যা সঠিকভাবে তুলে ধরবে না।

- ✓ যারা সংবেদনশীল, যাদের ইতিবাচক নীতি আছে, তাদের প্রতি বাড়তি মনোযোগ দিন। তাদের সাংবাদিককে আপনি খাস খবর দেবেন, সবার আগে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।
- ✓ তবে বিরুদ্ধ মতের বা নেতিবাচক নীতিসম্পন্ন মাধ্যমের সংবাদকর্মীদেরও খোলা মনে ডাকুন, তথ্য দিন।

সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রবণতার ধারার প্রতি সব সময় নজর রাখুন। সে অনুযায়ী আপনার অগ্রাধিকার-তালিকা পুনর্বিবেচনা করুন।

আপনাকে বুঝতে হবে, কোন খবরটি কার কাছে কী আকারে পৌঁছাতে চান। সেটা বুঝেও আপনি সংবাদমাধ্যম এবং সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে মনোনিবেশ করবেন।

- ✓ নীতিনির্ধারকদের মনোযোগ টানতে হলে আপনার দরকার বড় জাতীয় দৈনিক, ওয়েবসাইট, রেডিও ও টিভি।
- ✓ ছোটখাটো স্থানীয় খবরের জন্য স্থানীয় দৈনিককে বেশি গুরুত্ব দেবেন। চালু কমিউনিটি রেডিও আপনার জন্য বিশেষভাবে জরুরি হতে পারে।
- ✓ অর্থনীতির খবর অর্থনৈতিক পত্রিকা বেশি নেবে। আবার, একই মাধ্যমের মধ্যে নানা বিভাগ ও বিশেষ আয়োজনের অংশ থাকে, তাদের চাহিদাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন আদিবাসী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কোনো খবর ব্যবসা-বাণিজ্য পাতার জন্য ভালো খবর হবে। আদিবাসী নারীদের বিষয়ে কোনো ফিচার বা প্রতিবেদন নারীর পাতায় সহজে ছাপানো যাবে।
- ✓ সব সময় সংবাদের মূল পাতা বা ক্ষেত্রগুলো লক্ষ্য না করে আপনি এসব বিভিন্ন বিভাগীয় পাতায় বা অংশে জায়গা পাওয়ার চেষ্টা করবেন।
- ✓ সংবাদ প্রতিবেদন ছাড়াও ফিচার, উপসম্পাদকীয়, নিবন্ধ, ছবি, আলোচনা অনুষ্ঠান, তথ্যচিত্র– সব ধরনের প্রকাশনাকে লক্ষ্য করবেন। বিষয় বুঝে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিবেদক, বার্তা ব্যবস্থাপক ও সম্পাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

যোগাযোগের তালিকা

- জাতীয় সংবাদমাধ্যম ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন পর্যায়ের সাংবাদিকদের নাম-ঠিকানা-পদবি, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা রাখুন। নিয়মিত হালনাগাদ করুন। যাঁদেরগুলো অবশ্যই চাই: এলাকার প্রতিনিধি, এ বিষয়ে কাজ করা প্রতিবেদক, প্রধান প্রতিবেদক, বার্তা সম্পাদক, আঞ্চলিক খবরের সম্পাদক, ডেস্কের বিভিন্ন পালার দায়িত্বপ্রাপ্ত জনেরা বা শিফট ইন-চার্জ, সম্পাদকীয়

বিভাগের প্রধান, ফিচারসহ বিভিন্ন বিশেষ বিভাগীয় প্রধান, বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোনো সম্পাদক পদস্থ ব্যক্তি (যদি থাকে), সম্পাদক।

- সংবাদমাধ্যমের নীতি-সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্য প্রতিষ্ঠান ও সাংবাদিকদের তালিকা আলাদা রাখুন। একটি সাধারণ বড় তালিকা রাখুন।
- পিআইডির মিডিয়া গাইড, প্রেসক্লাব, রিপোর্টার্স ইউনিটিসহ সাংবাদিকদের পেশাজীবী সংগঠনগুলোর প্রধান পদাসীন সাংবাদিকদের যোগাযোগের তালিকা রাখুন।
- বিশিষ্ট নাগরিক, শিক্ষক, গবেষক, কলামলেখক, মানবাধিকার সংস্থা ও কর্মী, আদিবাসী বিষয়ে পর্যবেক্ষক– প্রাসঙ্গিক সকলের আলাদা আলাদা যোগাযোগের তালিকা রাখুন। এঁদের আপনি বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। কখনো গণমাধ্যমে একযোগে প্রচার-প্রচারণায় এঁদের সম্পৃক্ত করতে পারেন।
- সমমনা এনজিও, সিবিও বা সংগঠনের যোগাযোগ-তালিকা রাখুন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জোটবদ্ধভাবে গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগে এদের সমর্থন লাগবে।
- সব কটি তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করবেন।

টুকিটাকি

- নিজের প্রতিটি তৎপরতার মূল্যায়ন করুন। নিজের কাজের সাফল্য ও ব্যর্থতা পর্যালোচনা করুন। অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিন।
- গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাগুলোয় ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সম্পর্কে প্রকাশিত লেখাগুলো কেটে ভাগে ভাগে গুছিয়ে রাখুন। এতে সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিককে বুঝতে সুবিধা হবে। তা ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড গোছাতে এবং তথ্যকণিকা তৈরি করতে সাহায্য হবে।
- সাংবাদিকদের জন্য যখন যে কাগজপত্র তৈরি করছেন, তার কপি সংরক্ষণ করবেন। নিউজলেটার, বার্ষিক প্রতিবেদন, সমীক্ষাপত্র, গবেষণা প্রতিবেদন, ব্রোশিওরের একাধিক কপি সংগ্রহে রাখবেন।
- নিজের সংস্থা-সংগঠনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ-নজির গুছিয়ে রাখবেন। স্থানীয় আদিবাসী নেতাদেরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বক্তৃতা-বিবৃতির কপি রাখবেন।
- আপনার সংস্থা বা সংগঠন থেকে পাঠানো সব সংবাদ বিজ্ঞপ্তির কপি সংরক্ষণ করবেন।
- বিশেষ উপলক্ষে কোনো সংবাদমাধ্যমকে মিডিয়া পার্টনার করতে পারেন। তাদের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে খরচ দিয়ে গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করাতে পারেন।

টাকা দিয়ে সংবাদ করানো নয়

সাংবাদিককে টাকা দিয়ে খবর প্রকাশের ব্যবস্থা করতে যাবেন না। আজকাল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিতির জন্যও টাকা দেওয়া হয়। এটা সৎ সাংবাদিকতার চর্চার জন্য ভালো নয়। সাংবাদিকের মনে অনভিপ্রেত প্রত্যাশা তৈরি হয়। তা ছাড়া, দায়িত্বশীল সাংবাদিক এতে আপনার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা করবেন। সাংবাদিককে কিনে দীর্ঘ মেয়াদে আপনার লক্ষ্য সাধন করতে পারবেন না।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কোনো ঘটনা, অনুষ্ঠান বা কার্যক্রমের খবর জানাতে আপনি সংবাদমাধ্যমের কাছে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে থাকেন। আপনার পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটির তিনটি সম্ভাব্য পরিণতি ভেবে রাখুন:

- হুবহু প্রকাশ
- সম্পূরণ ও সম্পাদনার পর প্রকাশ
- পত্রপাঠ বাতিলের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া

হুবহু প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ, বাতিলের ঝুড়িতে যাওয়ার ভয় প্রবল। মনে রাখবেন, সংবাদমাধ্যমের বার্তাকক্ষে রোজ অনেক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি যায়, সুতরাং প্রতিযোগিতা তীব্র হবে।

আপনার প্রথম চেষ্টা হবে, সেটা যেন প্রকাশের জন্য অন্তত বিবেচিত হয়। সুতরাং নিশ্চিত করুন:

- বিজ্ঞপ্তিটি যেন সঠিক ব্যক্তির হাতে পৌঁছায়।
- টেবিলে স্তূপ হওয়া অথবা ইমেইলে ভিড় করা বিজ্ঞপ্তিগুলোর মধ্য থেকে আপনার 'শিশুটি' যেন সংশ্লিষ্ট সম্পাদক বা প্রতিবেদকের নজরে পড়ে।
- প্রতিবেদক বা কপি-সম্পাদক যেন সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পড়ে সেটার খবর প্রকাশ করতে আগ্রহী হন।
- পড়তে যেন বিরক্ত না লাগে; মূল কথা যেন চট করে সহজে বোঝা যায়।
- বিরাট রদবদল করে সম্পাদনা যেন করতে না হয়। হাতে কেটে সম্পাদনা করাও যেন সহজ হয়।
- বিজ্ঞপ্তিকে প্রতিবেদনে রূপ দেন প্রতিবেদক অথবা কপি-সম্পাদক। ধরে রাখতে পারেন যে, ভালো সাংবাদিক আরও কিছু বাড়তি তথ্য খোঁজ করবেন এবং যাচাই করতে চাইবেন। সেটার উপায় বাতলে দিন।
- ছবি এবং প্রয়োজনীয় নথি-প্রতিবেদন সংযুক্ত করুন।

পরামর্শ

ভালো সংবাদ বিজ্ঞপ্তি লেখার কিছু কলাকৌশল পরে বলব। আগে কিছু সাধারণ করণীয় দেখি:

ক্ষেত্র তৈরি করা

১. মূল বিজ্ঞপ্তির আগে দু-তিন বাক্যে বিষয় বা ঘটনাটি পরিষ্কার করে একটি চিঠি সংযুক্ত করবেন।

২. চিঠির সম্বোধনে 'বরাবর সম্পাদক' লিখবেন। কিন্তু সেটা কেবল সম্পাদকের কাছে পৌঁছালে চলবে না, তাঁর চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। বার্তা সম্পাদক, সংবাদের যে অংশে বা দৈনিক পত্রিকার যে পাতায় প্রকাশের সম্ভাবনা বেশি তার সম্পাদক, এবং প্রধান প্রতিবেদকের কাছে এর অনুলিপি দেবেন। বড় প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞপ্তি বাছাইয়ের প্রাথমিক কাজটি প্রধান প্রতিবেদক বা তাঁর সহকারীরা করে থাকেন।

৩. এঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় বা যোগাযোগের ক্ষেত্র আগে থেকে তৈরি রাখবেন। যাঁর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ সবচেয়ে ভালো, তাঁকে ফোন করে বিজ্ঞপ্তির কথা জানাবেন। স্পর্শকাতর বিষয়ে সরাসরি সম্পাদকের সঙ্গেও কথা বলা জরুরি হবে।

৪. এঁদের কোনো কিছু প্রকাশের সরাসরি অনুরোধ করবেন না। খুব সংক্ষেপে বিষয়টির গুরুত্ব বলে বিবেচনা করতে বলবেন। এতে খবরটি গুরুত্ব পাবে। বিশেষ কোনো প্রসঙ্গে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা জরুরি হলে করবেন। তবে কখনোই বারবার তাগাদা দেবেন না।

৫. এলাকার কোনো বিষয় বা ঘটনা হলে জাতীয় সংবাদমাধ্যমের স্থানীয় প্রতিনিধির সঙ্গে আগে আলাপ করে নেবেন। তাঁর জ্ঞাতসারে এবং তাঁর পরামর্শ নিয়ে ওপরের পর্যায়ে পাঠাবেন।

৬. প্রধান প্রতিবেদক, বার্তা সম্পাদকসহ সম্পাদকদের সঙ্গে সঙ্গে কথা বলার জন্য সবচেয়ে ভালো সময় একটু বেলা করে, দুপুরের দিকে। বিকেলের পর থেকে বার্তাকক্ষে ব্যস্ততার ঝড় শুরু হয়। তখন বাড়তি কথা বলে সময় নিলে এঁরা বিরক্ত হবেন।

৭. সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর কথা বারবার জানাবেন না; সেটা বিরক্তিকর হবে।

৮. সংবাদমাধ্যমের সংবেদনশীলতা বিচার করে অগ্রাধিকারভিত্তিক যে তালিকা করে রেখেছেন, সেগুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নিয়ে যোগাযোগ করবেন। এ ছাড়া, অন্যদেরও পাঠাবেন, তবে সবার সঙ্গে হয়তো ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ না-ও করতে পারেন।

সময় হাতে রেখে

১. সংবাদ বিজ্ঞপ্তি যথাসম্ভব আগে পাঠাবেন। যদি কোনো ঘটনা বিকেলের দিকে বা পরে ঘটে, তাহলে আপনাকে বিজ্ঞপ্তি তা পরপরই পাঠাতে হবে। নির্ধারিত কোনো অনুষ্ঠান হলে সকালেই কথা বলে রাখলেন, বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর একবার শুধু খোঁজ নিলেন তাঁর হাতে পৌঁছেছে কি না।

২. ই-মেইলে পাঠানোর সুযোগ থাকলে সেটা অবশ্যই করবেন। ই-মেইলে পাঠানো লেখা কম্পোজ করতে হয় না, ছবিও ছাপা সহজ হয়। তবে সম্ভব হলে সেই সঙ্গে কাগুজে কপিও পাঠাতে চেষ্টা করবেন। ই-মেইলে পাঠানো বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ল কি না, তা নিশ্চিত করতে অবশ্যই ফোন করবেন।

৩. দৈনিক পত্রিকার প্রত্যেক সংস্করণ এবং সাপ্তাহিক বিশেষ পাতাগুলোর জন্য আলাদা আলাদা ডেডলাইন থাকে। সেটা আপনার জানা থাকতে হবে। যেখানে খবরটি প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, সে বিভাগের ডেডলাইনের যথেষ্ট আগে বিজ্ঞপ্তিটি পাঠাবেন। দেরিতে পৌঁছালে ভালো খবরও প্রকাশের সুযোগ হারাতে পারে। অনলাইনের ক্ষেত্রে যত দ্রুত, তত ভালো। রেডিও-টিভির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বুলেটিনের ডেডলাইন থাকে। তবে সেখানে একটি হারালেও পরবর্তীটি দিনাদিন ধরতে পারার সুযোগ থাকে।

৪. বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে আরও কাগজপত্র থাকলে (কোনো বক্তৃতার পুরো কপি, কোনো প্রতিবেদন, কারও জীবনবৃত্তান্ত, প্রাসঙ্গিক কোনো সাক্ষাৎকার, উদাহরণ বা মানবিক কোনো বিবরণ, নথিপত্র, ব্রোশিওর) সেগুলোর কিছু কিছু আগে পাঠাতে চেষ্টা করবেন। পরে বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে আবার সংযুক্তি হিসেবে দেবেন। কোনো ওয়েবসাইটে প্রাসঙ্গিক তথ্য-প্রমাণ থাকলে সেগুলোর ঠিকানা দেবেন।

৫. হাতে সময় একেবারে কম থাকলে এবং ই-মেইলের সুযোগ না থাকলে ফ্যাক্সে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠাতে পারেন। তবে চেষ্টা করবেন যথাসম্ভব আগে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি তৈরি করে ফ্যাক্সের ব্যবহার এড়াতে। ফ্যাক্সে পাঠালে অবশ্যই ফোনে কথা বলে নেবেন। তারপরও কিন্তু ফ্যাক্সে পাঠানো কাগজ হারিয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া, ফ্যাক্সে আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পাঠানো ঝামেলার ব্যাপার।

আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি

১. চিঠি ও বিজ্ঞপ্তি– দুটির ওপরেই স্পষ্ট করে তারিখ দেবেন। বিজ্ঞপ্তির আকর্ষণীয় একটি শিরোনাম দেবেন।

২. আপনার সংস্থা-সংগঠনের প্যাডে, না থাকলে পরিষ্কার সাদা পাতায় বিজ্ঞপ্তি দেবেন। হাতে লিখতে হলে হাতের লেখা ভালো, এমন কাউকে দিয়ে লেখাবেন। তবে টাইপ করা বা কম্পিউটারে কম্পোজ করা হলে পড়তে সহজ এবং দেখতে পেশাদার হয়। ছোট হরফ ব্যবহার করবেন না। হাতে কাটাকাটি করবেন না।

৩. প্রতিটি কপি কম্পিউটার থেকে বের করতে চেষ্টা করবেন। ফটোকপি করলে দেখবেন কোথাও ঝাপসা বা অস্পষ্ট যেন না হয়।

৪. লাইন এবং অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে যথেষ্ট জায়গা ছাড়বেন। ডবল স্পেস রাখা ভালো। বাঁ দিকে চওড়া মার্জিন রাখবেন; হাতে সম্পাদনা করা সহজ হবে।

৫. বিজ্ঞপ্তি এক পৃষ্ঠা, বড়জোর দুই পৃষ্ঠার মধ্যে রাখবেন। বড় বিজ্ঞপ্তি বাতিল হওয়ার ভয় বেশি। প্রতি পৃষ্ঠায় তারিখ ও পৃষ্ঠা নম্বর দেবেন। পৃষ্ঠা নম্বর দেবেন এভাবে: ২-এর ১। পৃষ্ঠার নিচের দিকে লিখবেন 'পরবর্তী পৃষ্ঠা দেখুন'। লেখার শেষে লিখুন 'সমাপ্ত' অথবা ### চিহ্ন দিন। ফ্যাক্সে পাঠালে প্রতি পৃষ্ঠার ওপরে বিষয়ের উল্লেখ করবেন।

৬. গুরুত্বপূর্ণ খবর হলে রেডিও-টিভি বা অনলাইন মাধ্যমে তাৎক্ষণিক প্রকাশের জন্য আলাদা করে মূল কথার একেবারে সারসংক্ষেপ বিজ্ঞপ্তি তৈরি করতে পারেন।

৭. বাড়তি তথ্য বা কোনো কিছু যাচাই দরকার হলে যোগাযোগ করার জন্য দায়িত্বশীল কারও নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর দেবেন। এটা করার সুযোগ যে আছে, তা চিঠিতে এবং বিজ্ঞপ্তির শেষে পরিষ্কার করে লিখে

দেবেন। বিজ্ঞপ্তি যাঁর নামে যাচ্ছে, শেষে তাঁর নাম, পরিচিতি, পদ-পদবি, মোবাইলসহ ফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা তো অবশ্যই দেবেন।

৮. বাংলাভাষী সংবাদমাধ্যমের জন্য বিজ্ঞপ্তি বাংলায় লিখবেন। ইংরেজি গণমাধ্যমের জন্য ইংরেজিতে বিজ্ঞপ্তি পাঠাবেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুবাদ করতে হলে প্রতিবেদক-কপি-সম্পাদকের বাড়তি সময় যায়, ভুল হওয়ার ভয়ও থাকে।

৯. **ছবি:** বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে ছবি দিতে চেষ্টা করবেন।

- ✓ ছোট বা আঞ্চলিক পত্রপত্রিকায় নিজস্ব ছবির আকাল থাকতে পারে এবং ছবি পেলে তাদের আগ্রহ বাড়তে পারে।
- ✓ বড় দৈনিক সচরাচর, বিশেষ করে বড় ঘটনায়, নিজেদের আলোকচিত্রীর তোলা ছবি ছাড়া ব্যবহার করতে চায় না। তবু ছবিসহ বিজ্ঞপ্তি পাঠাবেন। অন্য বিজ্ঞপ্তিগুলোর থেকে তখন এটা আলাদা করে চোখে পড়বে।
- ✓ কিন্তু ই-মেইল-সুবিধা না থাকলে সব কটি সংবাদমাধ্যমের কাছে ছবি পাঠানো ব্যয়সাপেক্ষ। সে সামর্থ্য না থাকলে বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে বলে দেবেন যে, ছবি চাইলে পাওয়া যাবে। তবে খবরটি ধরানো জরুরি মনে করলে অন্তত একটি ছবি সঙ্গে দিতে চেষ্টা করবেন। আপনার অগ্রাধিকার-তালিকাভুক্ত সংবাদমাধ্যমগুলোর কাছে হয়তো একাধিক ছবি পাঠালেন।
- ✓ ছবি পাঠালে বিজ্ঞপ্তির মাথায় 'ছবিসহ' কথাটি লিখে দিতে পারেন।
- ✓ ছবির বিষয়বস্তু, স্থান, সময়, মানুষদের পরিচিতি টাইপ করে প্রতিটি ছবির উল্টো পিঠে জুড়ে দিন; ই-মেইলে হলে ছবির ক্যাপশন হিসেবে লিখে দিন। সেখানে সংবাদ বিজ্ঞপ্তির শিরোনাম ও আপনার সংস্থা-সংগঠনের নামও দেবেন। দুটি কারণে এটা করা জরুরি: বিজ্ঞপ্তি থেকে ছবি কখনো আলাদা হয়ে গেলে প্রতিবেদক বা কপি সম্পাদক পেছনের তথ্য ধরে দুটোকে আবার মেলাতে পারবেন; ছবি ছাপালে সেটার ক্যাপশন বা শিরোনাম লিখতে তাঁর সুবিধা হবে। কখনো হয়তো তিনি শুধু ছবিটিই ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বিষয়বস্তুর বিবরণ সুতরাং সংক্ষিপ্ত অথচ পর্যাপ্ত হতে হবে।
- ✓ সুযোগ থাকলে প্রাসঙ্গিক একটি ভিডিও ক্লিপ বা ইনফোগ্রাফিকসের মতো উপকরণ পাঠাতে পারেন।

মিলিয়ে দেখুন

প্রকাশিত প্রতিবেদনের সঙ্গে আপনার পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি মিলিয়ে দেখবেন। সাংবাদিক কী সম্পাদনা করেছেন? তথ্যের ক্রমে তিনি কী রদবদল করেছেন? কার্যকর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি লেখার দিকনির্দেশনা পাবেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি লেখা

আদর্শ সংবাদ বিজ্ঞপ্তির জন্য কিছু সাধারণ করণীয় ভাবা যায়:

- ✓ নিজের ঢাক বেশি পেটাবেন না। কেবল কথার ফুলঝুরি হলেও চলবে না। তেমন বিজ্ঞপ্তি সোজাসুজি বাতিল হয়ে যেতে পারে।
- ✓ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্যই কিছু যথার্থ খবর থাকতে হবে। সাংবাদিক বিজ্ঞপ্তি ঝেড়েবেছে সেটুকুতেই আগ্রহী হবেন।
- ✓ খবরের গড়পড়তা গ্রাহকের আগ্রহ জাগানোর মতো তথ্য-বিবরণ থাকতে হবে। সংবাদমূল্যের মাপকাঠিগুলো মাথায় রাখবেন।
- ✓ একবারে প্রতিবেদনের মতো করে লেখা সংবাদ বিজ্ঞপ্তি সম্পাদনা করতে ঝামেলা কম হয় এবং সময় বাঁচে দেখে প্রকাশের সম্ভাবনা বাড়ে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তির কাঠামো: প্রতিবেদনের সোজাসাপটা কাঠামো অনুসরণ করা ভালো। অর্থাৎ:

- ঘটনা বা বিষয়ের মূল কথা সংক্ষেপে স্পষ্ট করে জানাবেন। তথ্য ও বক্তব্যগুলো গুরুত্বের ক্রমানুসারে সাজাবেন। সচরাচর নিজের সংস্থার প্রচারণামূলক কথাবার্তা দিয়ে শুরু করতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো চলে যায় বিজ্ঞপ্তির মাঝামাঝি বা শেষের দিকে। এটা করা যাবে না। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আগে দেওয়ার দুটি কারণ:
    - ✓ এভাবে লিখলে প্রতিবেদক বা কপি-সম্পাদককে পুরো বিজ্ঞপ্তি হাতড়ে মূল সংবাদ খুঁজে বের করতে হয় না। কোন তথ্যগুলো জরুরি, তা তিনি চট করে বুঝতে পারেন।
    - ✓ কখনো মূল বিজ্ঞপ্তি মোটামুটি অক্ষুণ্ন রেখে ছাপাতে নিলে এবং সেটা শেষ মুহূর্তে ছোট করতে হলে তিনি শেষ দিক থেকে ছাঁটেন। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেষে থাকলে সেটা কিন্তু তখন বাদ পড়ে যাবে।
- যেকোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে মূল কথা জানাতে গেলে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দরকার হয়: কী ঘটেছে, কে বা কারা ঘটিয়েছে, কোথায় ঘটেছে, কখন ঘটেছে, কেন এটা ঘটেছে এবং কীভাবে এটা ঘটেছে। ঘটনা বা বিষয়ের ক্ষেত্রে যে প্রশ্নগুলো সবচেয়ে জরুরি, প্রথম অনুচ্ছেদে সেগুলোর চুম্বক উত্তর থাকবে।
    - ✓ সচরাচর প্রথম চারটি প্রশ্নের চুম্বক উত্তর বিজ্ঞপ্তির প্রথম অনুচ্ছেদেই থাকতে হবে।
    - ✓ প্রয়োজন হলে প্রথম অনুচ্ছেদে ছয়টি প্রশ্নেরই সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া যেতে পারে। তবে শেষ দুটি প্রশ্নের উত্তর সব সময় ধরানো সম্ভব হবে না। তাতে বক্তব্য জটিল হয়ে পড়তে পারে। সেগুলো তখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে গুরুত্বের ক্রমে আসতে পারে। কখনো আবার শেষ দুটি 'ক'-এর উত্তর জরুরি হতে পারে। তখন যেটা দরকার, সেটা প্রথম অনুচ্ছেদে দেবেন।
- ঘটনার সঙ্গে আপনার সংস্থা-সংগঠনের সম্পৃক্ততা থাকলে সেটা মূল বিষয়বস্তু সঙ্গে বিজ্ঞপ্তির গোড়ার দিকেই চলে আসবে। বিশেষ প্রয়োজন না হলে আপনার সংস্থার পরিচিতি দেবেন শেষে।

- এভাবে প্রথম দু-তিনটি অনুচ্ছেদে মূল কথার সারমর্ম জানিয়ে বিজ্ঞপ্তির বাকি অংশে সেগুলো কিছুটা বিস্তারিত জানাবেন।
  - ✓ মূল কথাগুলো জানানোর সময় আপনি চেষ্টা করবেন ঘটনা বা বিষয়ের তাৎপর্যের দিকটি স্পষ্ট করতে। সেটাও প্রথম কয়েক অনুচ্ছেদের মধ্যে করা দরকার।
  - ✓ প্রসঙ্গগুলো আসবে গুরুত্বের ক্রমানুসারে। অনুশিরোনাম বা সাবহেড দিয়ে বড় প্রসঙ্গগুলো চিহ্নিত করবেন।
- প্রসঙ্গগুলো তুলে ধরতে গিয়ে অবশ্যই আপনার সংস্থা-সংগঠনের প্রতিনিধির বক্তব্যসহ ঘটনায় জড়িত মানুষজনের মুখের কথার সরাসরি উদ্ধৃতি ব্যবহার করবেন।
  - ✓ সরাসরি উদ্ধৃতি লেখাকে প্রাণবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য করে। চেষ্টা করবেন, দ্বিতীয় বা তৃতীয় অনুচ্ছেদে কারও প্রাসঙ্গিক ভালো কোনো প্রত্যক্ষ উক্তি (উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে) যোগ করতে।
  - ✓ জোরালো ও আকর্ষণীয় উক্তি বেছে নেবেন। কোনো মতামত, মন্তব্য বা অভিযোগ কারও সরাসরি উক্তি হিসেবে আসা ভালো হবে।
  - ✓ বিজ্ঞপ্তিতে একাধিক প্রত্যক্ষ উক্তি থাকা ভালো হবে।
  - ✓ জরুরি ঘটনায়, অধিকারের প্রশ্নে বিশিষ্ট কোনো নাগরিক বা মানবাধিকারকর্মীর মন্তব্য নিতে পারলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তির গুরুত্ব বাড়বে।
  - ✓ যাঁর উক্তি তাঁর পুরো নাম ও পরিচয় পরিষ্কার করে উল্লেখ করবেন।
- যেখানে সম্ভব, ঘটনায় জড়িত মানুষজনকে বিবরণে প্রত্যক্ষ করে তুলবেন। এভাবে মানবিক প্রেক্ষাপট ফুটে উঠলে লেখাটি আকর্ষণীয় হবে। পরিস্থিতির সজীব বর্ণনা জরুরি হতে পারে। যেখানে সম্ভব উদাহরণ দেবেন। তবে এ সবই করবেন সংক্ষেপে।
- বিজ্ঞপ্তিতে যার নামই আসবে, সঠিক বানানে পুরো নাম চাই; পুরো পরিচিতি চাই।
- ব্যক্তিগত আক্রমণ বা ঢালাও কোনো অভিযোগ করবেন না। সুনির্দিষ্ট তথ্য-বক্তব্য চাই।
- তথ্যসূত্র অবশ্যই উল্লেখ করবেন।
- প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে উৎস উল্লেখ করে প্রামাণ্য তথ্য এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যা-পরিসংখ্যান দেবেন। সঙ্গে ছবি দেওয়ার কথা আগেই বলেছি। ছবি জরুরি প্রামাণ্য নিদর্শন হতে পারে। আবার, প্রসঙ্গ বুঝে গ্রাফ-চার্ট ইত্যাদিও সংযুক্ত করুন। মূল বিজ্ঞপ্তি ছোট রাখতে এগুলো সংযুক্তি হিসেবে দিন।
- অসম্পূর্ণ বা আধাখেঁচড়া তথ্য দেবেন না। তবে সংক্ষেপে লিখবেন। সুতরাং মূল বিষয়বস্তুতে মনোযোগ দিয়ে আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি বাদ রাখুন। এমনিতেও প্রতিবেদক বা সম্পাদকের বাড়তি তথ্য লাগলে তিনিই ফোন করে খোঁজ করবেন।

- গড়পড়তা সাধারণ গ্রাহকের কথা মাথায় রেখে তথ্য-বক্তব্য গুছিয়ে লিখবেন। ক্ষুদ্র জাতিসত্তা-সংক্রান্ত বিষয়গুলো অনেকের অজানা থাকতে পারে। সবার বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা থাকতে হবে।

- প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপট বা পশ্চাৎপট (ব্যাকগ্রাউন্ড) অবশ্যই দেবেন। বড় কোনো ব্যাখ্যা বা ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার হলে সংযুক্তিতে দিন এবং লেখায় তা নির্দিষ্ট করে জানান।

  সতর্ক থাকুন: বিভিন্ন প্রসঙ্গের তথ্য-বক্তব্যগুলো সহজ যৌক্তিক ধারায় বিন্যাস করবেন।

  - ✓ আগের কথা পরে, পরের কথা আগে– এমন যেন না হয়; এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে যেন না পড়ে।
  - ✓ আলাদা আলাদা তারিখের ঘটনা উল্লেখ করলে সেটা যেন পরিষ্কার বোঝা যায়।
  - ✓ এক ধরনের তথ্য-বক্তব্যগুলো একত্রে রাখবেন।
  - ✓ এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া মসৃণ ও যুক্তিসংগত হতে হবে।
  - ✓ কিছুতেই যেন বড় না হয়। পুনরাবৃত্তি থেকে সাবধান।

লেখা: লেখা হবে সহজ, সুস্পষ্ট, সুপাঠ্য।

- সহজ পরিচিত শব্দ ব্যবহার করবেন। তবে বস্তাপচা সস্তা শব্দ বা ক্লিশে এড়িয়ে চলুন। আদিবাসী কোনো ভাষার অথবা যেকোনো অপরিচিত বা কারিগরি শব্দ ব্যবহার করতে হলে সেটার সহজ অর্থ বুঝিয়ে লিখবেন।

- অপরিচিত বিষয় বা ধারণা দু-তিনটি শব্দে বুঝিয়ে লিখবেন।

- বাংলা বিজ্ঞপ্তিতে ইংরেজি শব্দ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন; যেমন, 'ইনডিজেনাস পিপলস ডে' না লিখে লিখুন 'আদিবাসী দিবস'।

- শব্দ প্রয়োগে ভুল হলে কথার অর্থ পাল্টে যেতে পারে। যথাযথ শব্দটি বেছে নিন। কঠিন, বিভ্রান্তিকর বা দুই অর্থ হতে পারে– এমন শব্দ ব্যবহার করবেন না। সব সময় অভিধান দেখে নেবেন।

- কোনো শব্দসংক্ষেপ ব্যবহার করলে প্রথম উল্লেখে তা ভেঙে বলবেন– ইউএনডিপি বা জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি। অপরিচিত হলে সে শব্দসংক্ষেপ এড়িয়ে চলুন। কিছু শব্দসংক্ষেপ বুঝিয়ে লিখতে হতে পারে। যেমন, সিএসআর– করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি অর্থাৎ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সমাজকল্যাণমূলক কার্যকলাপ বা সামাজিক দায়িত্ব।

- অশালীন, আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করবেন না।

- যতিচিহ্ন বা পাংকচুয়েশন ব্যবহারে ভুল হলে কথার অর্থ বোঝা কঠিন হয়, অর্থ পাল্টেও যায়। প্রথম আলো ভাষারীতি বা আনন্দবাজার পত্রিকার বাংলা কী লিখব, কেন লিখব বইটি কিনে নিন। ইংরেজির জন্য স্কুলপাঠ্য কোনো ব্যাকরণ বই জোগাড় করে নিন।

- বানান ভুল যেন না থাকে। ভালো কোনো বাংলা ও ইংরেজি অভিধান হাতের কাছে রাখুন।

- বাক্য হবে সরল ও সরাসরি। বাংলা বাক্যে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া এবং ইংরেজি বাক্যে সাবজেক্ট-ভার্ব-অবজেক্ট– এই স্বাভাবিক গঠন অনুসরণ করবেন। এক বাক্যে একটি কথা বলতে চেষ্টা করুন। একাধিক বাক্যাংশযুক্ত জটিল বা যৌগিক বাক্য লিখবেন না। এভাবে বাক্য ছোটও থাকবে। গড়পড়তা ১৭ শব্দের বাক্য সবচেয়ে সহজে বোঝা যায়। বাক্য ২২/২৩ শব্দ ছাড়াতে নিলেই লাগাম টানুন।
- অনুচ্ছেদও ছোট রাখুন। তিন থেকে চারটি ছোট বাক্যে অনুচ্ছেদ গড়ুন। একটি অনুচ্ছেদে একটি বিষয় পরিষ্কার করতে মন দিন। প্রসঙ্গ পাল্টালে নতুন অনুচ্ছেদে যান। অনুচ্ছেদগুলো আলাদা করতে মধ্যে বেশি জায়গা ছাড়ুন বা একটু ইনডেন্ট করে দিন।
- মোটামুটি সংক্ষিপ্ত এবং আকর্ষণীয় একটি শিরোনাম দেবেন। সংবাদ শিরোনাম একেবারে সংক্ষেপে পাঠক-শ্রোতা-দর্শককে মূল বিষয়বস্তু আভাস দেয়। আপনার শিরোনাম অতখানি সংক্ষিপ্ত না হলেও চলবে। আপনার শিরোনামের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিবেদক বা সম্পাদকের নজরে পড়া, তাঁকে মূল বিষয়বস্তুর সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং/অথবা সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কথাটি একনজরে জানিয়ে দেওয়া। শিরোনামটি পড়েই কিন্তু তিনি প্রথম বাছাইটা করবেন।

অনেকে পরামর্শ দেন, তৃতীয় কোনো সাধারণ পাঠককে দিয়ে বিজ্ঞপ্তিটি একবার পড়িয়ে নিতে। সহজবোধ্যতা নির্ণয় করার এটা একটি ভালো উপায়।

- ✓ প্রয়োজনীয় সংশোধন, পুনর্মার্জন ও সংযোজনের পর নতুন করে পরিচ্ছন্ন কপিটি কম্পিউটার থেকে বের করে নিন অথবা আবার লিখে বা টাইপ করে নিন।
- ✓ আগে পাঠিয়ে থাকলেও অত্যাবশ্যক সহায়ক তথ্য-উপকরণ আবার সংযুক্ত করুন।

নিজে লেখা এবং সেটা ছাপানো

পত্রপত্রিকায় আপনি নিজেও আদিবাসী বিষয়ে ফিচার বা নিবন্ধ লিখতে পারেন। তবে লেখার চর্চা ও অনুশীলন লাগবে। যে পাতায় ছাপাতে চাইছেন, সে পাতার লেখা নিয়মিত পড়ুন। সম্পাদক ও পাঠকের চাহিদার আন্দাজ পাবেন। এ ছাড়া, সংশ্লিষ্ট সম্পাদকের কাছে বিষয় প্রস্তাব করে তাঁর সম্মতি ও পরামর্শ নিয়ে নেবেন। বিশেষ জরুরি, শব্দসীমা জেনে নেওয়া এবং সেটার মধ্যে সীমিত থাকা।

৬

প্রেস কনফারেন্স বা সংবাদ সম্মেলন

বড় কোনো ঘটনা, কোনো সমীক্ষা বা গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ, কোনো সিদ্ধান্ত বা প্রতিবাদ– জনমানুষকে জরুরি কিছু জানানোর থাকলে আপনি সাংবাদিকদের ডেকে সংবাদ সম্মেলন করবেন।

আয়োজন

- আটঘাট বেঁধে সময় নিয়ে আয়োজন করলে সংবাদ সম্মেলন কার্যকরভাবে করা যায়। হঠাৎ বা চটজলদি সংবাদ সম্মেলন করতে হলে সব সাংবাদিকের উপস্থিতি নিশ্চিত করার মতো যথেষ্ট জোরালো কারণ থাকতে হবে।
- এমনিতেও বিষয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বা আগ্রহব্যঞ্জক হলে তবেই আপনি সংবাদ সম্মেলন ডাকবেন। ছোটখাটো বিষয়ের সংবাদ সম্মেলন পাত্তা পাবে না। তা ছাড়া বারবার ছোট বিষয়ে সাংবাদিকদের ডাকলে পরে বড় বিষয়েও তাঁরা আসতে দ্বিধা করবেন, ভাববেন সেটাও হয়তো বরাবরের মতো মামুলি কিছু নিয়ে হচ্ছে।
- আমন্ত্রণপত্র পাঠাবেন আগের দিন সকালের দিকে। বেশি আগে পাঠালে সেটার কথা কারও মনে থাকবে না। আবার আগের রাতে দেরি করে পাঠালে সংবাদমাধ্যমের কাউকে সেখানে পাঠানোর সুযোগ কমে যাবে।
- চিঠি দিলেও ফোন অবশ্যই করবেন; বিশেষ করে, আপনার অগ্রাধিকার তালিকার সাংবাদিকদের।
- আমন্ত্রণপত্রে বিষয়টি পরিষ্কার করে লিখবেন এবং সংক্ষেপে এটা ডাকার প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব তুলে ধরবেন। বিষয়ের আকর্ষণীয় দিকগুলো জানিয়ে দেবেন। যেমন, কোনো বড় নেতা বা ভুক্তভোগী কারও উপস্থিতি; ভালো ছবি তোলার কোনো সুযোগ; কোনো নতুন তথ্য জানানোর থাকলে সেটার কথা; অথবা কোনো বিতর্কের ইঙ্গিত।
- সময় এবং স্থান সুস্পষ্ট করে লিখবেন।
- সকালের দিকে সময় ঠিক করা সবচেয়ে ভালো। তবে খুব সকালে ডাকবেন না। সাংবাদিকেরা অনেক রাত অব্দি কাজ করেন। বেলা ১১টা-১২টার মধ্যে ডাকাটা সবচেয়ে ভালো।
- সাংবাদিকের যাওয়া সহজ এবং পরিচিত জায়গায় সংবাদ সম্মেলন ডাকবেন। স্থানীয় প্রেসক্লাবে বড় ঘর থাকলে সেটা ব্যবহার করুন। অপরিচিত জায়গা হলে সঙ্গে ম্যাপ দেবেন।

- কী কী হবে আমন্ত্রণপত্রে, সেটার ক্রমানুসারে সূচি দেবেন। কোনো সাংবাদিক দেরিতে পৌঁছালেও খেই ধরতে পারবেন।
- সংবাদ সম্মেলনের বিষয় নিয়ে আগে থাকতে প্রধান প্রতিবেদক, আপনার পরিচিত প্রতিবেদক এবং/অথবা সম্পাদক পর্যায়ের কারও সঙ্গে কথা বলে রাখুন। সময় থাকতে একবার মনে করিয়ে দেবেন।
- প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র থাকলে সেগুলো, ছবি বা প্রেক্ষাপটের তথ্য আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে আগাম পাঠাবেন। বিষয়টি স্পষ্ট হবে, সাংবাদিক তৈরি হয়ে যেতে পারবেন।

সম্মেলন অনুষ্ঠান

- কোনো জনগোষ্ঠীর সমস্যা-সংকট নিয়ে হলে সব সময় ভুক্তভোগী কয়েকজনকে সঙ্গে রাখুন।
- ব্যবস্থাপনার দিক আছে। ঘণ্টা দুই আগে পৌঁছাবেন। মাইক ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ঠিকমতো কাজ করছে কি না দেখুন। বসার বন্দোবস্ত তদারক করুন। মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা– ছবি, ভিডিও-ক্লিপ, শব্দ প্রক্ষেপণ– সবকিছু ঠিকমতো কাজ করছে কি না দেখে নিন।
- তৈরি থাকুন, দু-একজন সাংবাদিক আগে পৌঁছাবেন। তাঁরা আপনার কাছে প্রাথমিক তথ্য-কাগজপত্র চাইবেন।
- সাংবাদিকদের নাম-পরিচয়, ফোন, ই-মেইল নিবন্ধন করুন। আপনার যোগাযোগের তালিকা সমৃদ্ধ ও হালনাগাদ করতে কাজে লাগবে।
- সংবাদ সম্মেলনের দুটি অংশ থাকে। প্রথমে আপনি আপনার উদ্দেশ্য ও বিষয় খুলে বলেন। তারপর থাকে সাংবাদিকের প্রশ্ন ও আপনার তরফের উত্তর।
- সব মিলিয়ে খুব বড় যেন না হয়। ৩০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টার আন্দাজ ধরে রাখুন। নিজেদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার রাখবেন। তবে ভুক্তভোগী মানুষজনকে উপস্থিত করালে তাদের কথা বলার পর্যাপ্ত সময় দেবেন।
- প্রশ্নোত্তর অংশ খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ করবেন না, তবে একেবারে টেনে বড় করতেও দেবেন না। অনেক সাংবাদিক থাকলে শুরুতেই বলে দিতে পারেন যে, একেকজন একটি মূল ও একটি সম্পূরক প্রশ্ন করার সুযোগ পাবেন।
- সম্মেলনের শেষে প্রতিবেদক সাক্ষাৎকার নিতে চাইবেন। কে কী বলবেন, তা আগে ঠিক করে রাখুন।
- সাংবাদিক ছবি তুলতে চাইবেন। ভালো ছবি কী হতে পারে, এটা ভাববেন এবং সম্ভব হলে ব্যবস্থা রাখবেন।

- পত্রপত্রিকার সাংবাদিক আরও বিস্তারিত তথ্য চাইতে পারেন। ভুক্তভোগীদের সাক্ষাৎকার নিতে চাইতে পারেন। সহায়তা করবেন। সম্মেলন শেষে চা পর্ব রাখুন। সে সময় অনানুষ্ঠানিক আলাপ যেমন হতে পারবে, তেমনি এ কাজগুলো সারা যাবে।
- সম্মেলন শেষ হওয়ার পরও এক-দেড় ঘণ্টা সেখানে থাকুন। অনেক সাংবাদিক দেরিতে পৌঁছাতে পারেন।
- সংবাদ সম্মেলনের বিবরণ দিয়ে বিজ্ঞপ্তি সব সময় পাঠাবেন। সঙ্গে ছবি দেবেন। অনেক সময় কোনো সংবাদমাধ্যম হয়তো কোনো প্রতিবেদককে পাঠাতে পারেন না। আবার, প্রতিবেদক নিজে উপস্থিত থাকলেও কিছু প্রসঙ্গ তাঁর নজর এড়িয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া, বিজ্ঞপ্তি ধরে তিনি নিজের নোট মিলিয়ে নিতে পারেন।

সাংবাদিকদের মোকাবিলা করা

- অসৌজন্য প্রকাশ করবেন না। তবে নিজের বক্তব্য জানাতে দৃঢ় থাকবেন।
- সম্ভাব্য প্রশ্ন ভেবে উত্তর চিন্তা করে রাখবেন।
- কেউ খোঁচা দিয়ে প্রশ্ন করলেও উত্তেজিত হবেন না।
- প্রশ্ন সবই নেবেন। তবে কোনোটির উত্তর দিতে না চাইলে সেটা সৌজন্যের সঙ্গে বুঝিয়ে বলবেন।
- ভুক্তভোগী কোনো মানুষকে সাংবাদিকের সামনে উপস্থিত করলে নজর রাখবেন, সাংবাদিকের প্রশ্নে তিনি উৎপীড়িত বোধ করছেন কি না। কোনো অবস্থাতেই কোনো সাংবাদিককে তাঁকে নাজেহাল বা উত্ত্যক্ত করতে দেবেন না।
- যৌন নিপীড়নের শিকার নারী, নাজুক অবস্থানের শিশুসহ যেকোনো ভুক্তভোগী বা ভিকটিমের ছবি তুলতে দেবেন না। তাঁর নিরাপত্তার কথা ভাববেন। সাংবাদিককে বলবেন, তাঁর নাম-পরিচয় নিশ্ছিদ্রভাবে গোপন রাখতে।

তথ্যকণিকা

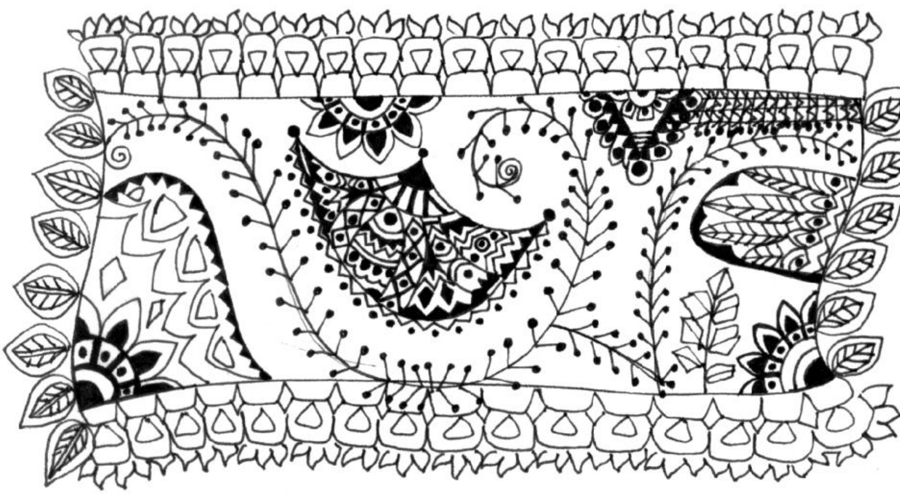

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বলতে কাকে বোঝানো হয় এবং 'আদিবাসী' বনাম 'উপজাতি' সংজ্ঞা, সেগুলোর অর্থ ও তাৎপর্যের বিষয়গুলো আমরা এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত দেখেছি। এখানে আমরা বাংলাদেশের এসব জাতি সম্পর্কে কিছু মৌলিক তথ্য-উপাত্ত দেখব।

সংখ্যা নিয়ে নানা মত: বাংলাদেশে কয়টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আছে এবং তাদের জনসংখ্যা কত– এ দুটি প্রশ্নের পরিষ্কার বা নিরঙ্কুশ কোনো উত্তর মেলে না।

- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংখ্যার নানা রকমের হিসাব পাওয়া যায়। বিভিন্ন সূত্রে এ সংখ্যা ২৬ থেকে ৫৭টি পর্যন্ত বলা হয়েছে। কোনো জরিপ বা সেভাবে আলাদা করে গোনাগাথা না থাকায় সুনিশ্চিত করে বলা কঠিন; তবে ২০১৯ সালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। সেটা বলছে, 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী'র সংখ্যা ৫০টি। তবে আরও কিছু গোষ্ঠী নিজেদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করে। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম বলে, সংখ্যাটি অন্তত ৫০।

  নৃবিজ্ঞানীরা বলছেন, এর কিছু একেবারে ক্ষুদ্র জাতি, কিছু হয়তো বড় কোনো জাতির ভাগ। তা ছাড়া, বেশ কিছু জাতি আসলে বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রান্তে মিশে যাওয়া সাবেক ক্ষুদ্র জাতিসত্তা; বিশেষত মন্ত্রণালয়ের তালিকায় যাদের নাম ওঠেনি, তারা। এরা নিজেরাও হয়তো কেউ কেউ বাঙালি সমাজের অংশ হিসেবেই পরিচিত হতে চায়। তবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কিছু স্বাতন্ত্র্য, প্রান্তিকতা ও আর্থসামাজিক সুযোগবঞ্চিত অবস্থানের বিবেচনায় এবং উন্নয়নসহ বিশেষ মনোযোগের দাবিদার হিসেবে এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার গণ্ডিতে দেখা যুক্তিযুক্ত।

- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের সংখ্যা কত, সেটার সার্বিক হিসাবের জন্য জাতীয় জনশুমারির কাছে যেতে হয়। তবে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের পক্ষ থেকে সব সময় জনশুমারিতে তাদের সংখ্যা কম গণনার অভিযোগ করা হয়। নৃবিজ্ঞানীরাও এ প্রশ্ন তুলেছেন। কোনো কোনো অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত কিছু বেসরকারি জরিপ ও শুমারি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের সংখ্যা সরকারি জনশুমারির চেয়ে বেশি দেখিয়েছে। এ ছাড়া, আরেকটি বড় আপত্তির ক্ষেত্র আছে।

  বাংলাদেশে জনশুমারি হয় দশ বছর পর পর। ১৯৯১ ও ২০০১ সালের জনশুমারিতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষকে ভাগ করার মাপকাঠিতে একটি পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমটিতে এ ভাগ করা হয়েছে জাতিভিত্তিক, অন্যটিতে ধর্মভিত্তিক। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিনিধিরা এবং অনেক নৃবিজ্ঞানী প্রথমটির তালিকাকে অসম্পূর্ণ ও কিছুটা ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। অন্যদিকে, তাঁরা দ্বিতীয়টিতে শুধু ধর্মভিত্তিক বিভাজনের যুক্তিযুক্ততা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন।

২০১১ সালের জনশুমারিতে সংজ্ঞায়ন ও অন্যান্য বিষয়ে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০' অনুসরণ করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংখ্যা তখন ছিল ২৭টি। তবে এর জাতীয় পর্যায়ের প্রতিবেদনে জাতিসত্তাগুলোর নাম ছিল না। অবশেষে ২০২২ সালের জনশুমারিটি একই আইন এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৯ সালের প্রজ্ঞাপন অনুসরণে জনসংখ্যা ও তাদের কিছু বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। প্রজ্ঞাপনটিও এই আইনের (ধারা ১৯) ক্ষমতাবলেই করা হয়েছিল। জনশুমারিতে ওই তালিকাভুক্ত ৫০টি 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী'র তথ্য নেওয়া হয়। এ ছাড়া ছকে 'অন্যান্য' বলেও একটি ঘর ছিল। জাতিসত্তা ধরে বিভাগওয়ারি নারী-পুরুষ ভাগ করা হিসাব আছে। জাতীয় পর্যায়ে বয়সের ভাগও আছে।

ভৌগোলিক অবস্থান: জনশুমারি প্রতিবেদনগুলোয় দেখা যায়, ৬৪ জেলার প্রতিটিতেই কিছু না কিছু আদিবাসী মানুষ আছে। বাংলাদেশে এদের বড় বসতির এলাকাগুলো হচ্ছে: দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা; উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে বৃহত্তর রাজশাহী ও রংপুরের জেলাগুলো; উত্তর-পূর্বে সিলেট বিভাগের জেলাগুলো; উত্তর-মধ্যাঞ্চলে বৃহত্তর ময়মনসিংহের জেলাগুলো, বিশেষ করে গড় বা বনাঞ্চল ও সীমান্ত এলাকা। এ বাদে, দক্ষিণের উপকূলীয় কিছু জেলায় একটি মোটামুটি বড় ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বাস। লক্ষণীয়, এসব এলাকা ভারত অথবা মিয়ানমারের সীমান্তঘেঁষা। আদিবাসী-অধ্যুষিত এসব অনেক এলাকা এখনো দুর্গম ও প্রত্যন্ত, বা একসময় তেমনটা ছিল।

'উপজাতীয়'দের ধর্মভিত্তিক ভাগ

বাংলাদেশের জনশুমারিতে ২০২২ সালের আগে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষকে 'উপজাতীয়' হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। ২০০১ সালে হওয়া জনশুমারির প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোয় পুরো দেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের মোট সংখ্যা এবং জেলাওয়ারি সংখ্যা পাওয়া যায়। উপজেলাভিত্তিক বসতির তথ্য ধরে আদিবাসীঘন এলাকাগুলো চট করে পাওয়া যায়।

এসব প্রতিবেদনে আদিবাসীদের জাতিসত্তা ধরে ভাগ করে তাদের আলাদা আলাদা জনসংখ্যা দেখানো হয়নি। জাতীয় প্রতিবেদনমালার প্রথম খণ্ডে ২০০১ জনশুমারিতে প্রাপ্ত তথ্য-পরিসংখ্যানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে। সেখানে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক ভাগ পাওয়া যায়। জেলাওয়ারি প্রতিবেদনে অর্থাৎ কমিউনিটি সিরিজের প্রতিবেদনগুলোয় জেলার নিবাসীদের ধর্মভিত্তিক সংখ্যার পাশাপাশি 'ট্রাইবাল' বা 'উপজাতীয়'দের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে।

তবে কিছু জেলার প্রতিবেদনে 'উপজাতীয়'দের সংখ্যা দেওয়া নেই। তা ছাড়া, জাতীয় প্রতিবেদনমালার প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে, জেলা প্রতিবেদনমালায় 'উপজাতীয়' ও 'ধর্মসংক্রান্ত' কোডের ভুল শ্রেণীকরণের জন্য কিছু ভুল রয়ে গেছে। সুতরাং সংখ্যার জন্য জেলা প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করা যাবে না, জাতীয় প্রতিবেদনমালার প্রথম খণ্ড দেখতে হবে। এ খণ্ডেই জেলা ও উপজেলাভিত্তিক আদিবাসী জনসংখ্যার হিসাব আছে।

তবে ২০০১ সালের এসব কোনো প্রতিবেদনেই ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষেরা জেলার মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ, তা বলা হয়নি। সেটা অবশ্য বের করে নেওয়া যায়। এভাবে হিসাব করলে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই জেলায় তাদের জনসংখ্যা বাঙালিদের চেয়ে কম, একটিতে যৎসামান্য বেশি– খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে তারা মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ৩৭ ও ৪৮ শতাংশ; রাঙামাটিতে তারা ৫১ শতাংশ। গণনায় বাদ

পড়ার প্রশ্ন আছে। এ ছাড়া এই অঞ্চলে দু-তিন দশক আগেও জনশুমারি অনুযায়ীই আদিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল– যত পেছন দিকে যাবেন, তত বেশি।

২০১১ সালের জনশুমারিতে ২৭টি 'উপজাতি' ধরে মোট নৃগোষ্ঠীগত বা 'ট্রাইবাল' জনসংখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এতে ধর্মভিত্তিক সংখ্যা ছিল। জেলাভিত্তিক জনসংখ্যাও ছিল।

২০২২ সালের জনশুমারির জাতীয় প্রতিবেদনে ধর্মভিত্তিক সংখ্যা দেওয়া নেই। এদিকে জেলায় আনুপাতিক হার বের করলে দেখা যাচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার চিত্র সামান্য পাল্টেছে– খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে তারা মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ৪৯ ও ৪১ শতাংশ; আর রাঙামাটিতে ৫৮ শতাংশ।

সংখ্যা ও অবস্থান

১৯৮১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পাঁচটি জনশুমারির প্রতিবেদন বলছে:

- ✓ ২০২২ সালে দেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মোট জনসংখ্যা ছিল ১৬ লাখ ৫০ হাজার ৪৭৮ (১৬,৫০,৪৭৮); এরা দেশের মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ।
- ✓ ২০১১ সালে দেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মোট জনসংখ্যা ছিল ১৫ লাখ ৮৬ হাজার ১৪১ (১৫,৮৬,১৪১); এরা দেশের মোট জনসংখ্যার ১.১০ শতাংশ।
- ✓ ২০০১ সালে দেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মোট জনসংখ্যা ছিল ১৪ লাখ ১০ হাজার ১৬৯ (১৪,১০,১৬৯); এরা দেশের মোট জনসংখ্যার ১.১৩ শতাংশ।
- ✓ ১৯৯১ সালে দেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মোট জনসংখ্যা ছিল ১২ লাখ ৫ হাজার ৯৭৮ (১২,০৫,৯৭৮); মোট জনসংখ্যায় এদের হার একই ছিল, ১.১৩ শতাংশ।
- ✓ ১৯৮১ সালে দেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মোট জনসংখ্যা ছিল ৮ লাখ ৯৭ হাজার ৮৮২ (৮,৯৭,৮২৮); তখন মোট জনসংখ্যায় এদের হার কিছু কম ছিল, ১.০৩ শতাংশ।

২০২২ সালের জনশুমারিতে প্রথমবারের মতো তাদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলা হয়। শুমারিতে ৫০টি এবং 'অন্যান্য' ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ধরে জনসংখ্যার হিসাব করা হয়েছে। 'অন্যান্য' হিসেবে গণনা করা মানুষের সংখ্যা ৬৮ হাজার ৫৮৮ (৬৮,৫৮৮)। প্রতিবেদনে রয়েছে বিভাগ ও জেলাওয়ারি হিসাব।

২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী:

- বাংলাদেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের অর্ধেকের বেশি বাস করে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত জনসংখ্যার মধ্যে সর্বাধিক ৯,৯১,০১৩ জন চট্টগ্রাম বিভাগে বসবাস করে, যা এ জনগোষ্ঠীর ৬০.০৪ শতাংশ।
- এ ছাড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ১৪.৮২ শতাংশ রাজশাহী, ৮.২৮ শতাংশ, সিলেট, ৫.৫২ শতাংশ রংপুর এবং ৪.৯৯ শতাংশ ঢাকা বিভাগে বসবাস করে।

তবে এসব প্রতিবেদনের তথ্যগুলো দেখার সময় জাতিসত্তা ও মানুষের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন ও দ্বিমতের কথা মাথায় রাখতে হবে।

সাক্ষরতা, জীবিকা ও দারিদ্র্য, ধর্ম

জনশুমারি ২০২২-এর জাতীয় প্রতিবেদনে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাক্ষরতার হার, তাদের জীবিকা ও ধর্ম-সংক্রান্ত তথ্য চোখে পড়ে না। এর আগের চারটি জনশুমারি প্রতিবেদনে এমন তথ্য দেওয়া হয়েছে। একে একে দেখা যাক।

সাক্ষরতার হার: আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় পর্যায়ের তুলনায় সাক্ষরতার হার খুবই কম; তবে ১৯৮১ সালের তুলনায় এটা বেড়েছে। দেশের আদিবাসী জনসংখ্যায় সাত বছরের চেয়ে বেশি বয়সীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার এ রকম:

- ✓ ১৯৮১: ১৬.২ শতাংশ; পুরুষদের ২৩.১ এবং মেয়েদের ৮.৪ শতাংশ।
- ✓ ১৯৯১: ২৪.৯ শতাংশ; পুরুষদের ৩১.৬ এবং মেয়েদের ১৭.৯ শতাংশ।
- ✓ ২০০১: ৩২.২ শতাংশ; পুরুষদের ৩৯.৩ এবং মেয়েদের ২৪.৮ শতাংশ।
- ✓ ২০১১: ৩৭.৫ শতাংশ; পুরুষদের ৪২.৮ শতাংশ এবং মেয়েদের ৩২ শতাংশ।

জীবিকা: ২০২২ এবং ২০১১ সালের জাতীয় পর্যায়ের প্রতিবেদনে এ-সংক্রান্ত তথ্য চোখে পড়ে না। ২০০১ সালের জনশুমারি বলছে, আদিবাসী খানাগুলোর আয়ের মূল উৎস ছিল:

- ✓ ২৯.৬ শতাংশের জন্য কৃষি/গবাদিপশু/বন।
- ✓ ২০.৩ শতাংশের জন্য কৃষিমজুরি।
- ✓ ১৪.৮ শতাংশের জন্য ব্যবসা
- ✓ ১০.৮ শতাংশের জন্য বেতন বা মজুরি।
- ✓ ০৩.৮ শতাংশের জন্য পরিবহন/যোগাযোগ।
- ✓ ০৩.৯ শতাংশের জন্য অ-কৃষি মজুরি।
- ✓ বাকিরা মাছ চাষ, বাইরে উপার্জনকারীর পাঠানো টাকা, নির্মাণ, বুনন ইত্যাদি এবং অন্যান্য উৎসের ওপর নির্ভরশীল।
    - ➢ ১৯৯১ সালে কৃষি-পশু-বন, কৃষি মজুরি এবং বেতন/মজুরিনির্ভরতা আরও অনেক বেশি ছিল। ২০০১ সালে এ জীবিকাগুলোর ওপর নির্ভরতা যেমন কমেছে; তেমনি ব্যবসা, পরিবহন খাত, নির্মাণ ইত্যাদি বেড়েছে।
    - ➢ ২০০১ সালের জনশুমারি এবং ২০05 সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ও বিশ্বব্যাংক ২০০৯ সালে দেশে দারিদ্র্যের হালনাগাদ মানচিত্র প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, আদিবাসী-অধ্যুষিত অনেক এলাকাই অধিক দরিদ্র এলাকাগুলোর মধ্যে পড়ছে।

.

জাতিসত্তা ধরে না, ধর্ম ধরেঃ আগেই বলেছি, ২০২২ সালে ধর্ম ধরে কোনো হিসাব নেই, তবে জাতিসত্তা ধরে একটা হিসাব মিলছে। পক্ষান্তরে ২০১১ সালে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মোট জনসংখ্যাকে শুধু ধর্ম অনুসারে ভাগ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়ঃ

- ✓ বৌদ্ধ ৪৫.৩৬ শতাংশ
- ✓ হিন্দু ২৭.৭৩ শতাংশ
- ✓ মুসলিম ২.৬৪ শতাংশ
- ✓ খ্রিষ্টান ১৩.৩২ শতাংশ
- ✓ অন্যান্য ১০.৯৪ শতাংশ

২০০১ সালেও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মোট জনসংখ্যাকে ভাগ করা হয়েছে ধর্ম অনুসারে। এতে দেখা যায়ঃ

- ✓ বৌদ্ধ ৩৬.৭৩ শতাংশ
- ✓ হিন্দু ২১.২৯ শতাংশ
- ✓ মুসলিম ১৭.৩৪ শতাংশ
- ✓ খ্রিষ্টান ১১.৫৭ শতাংশ
- ✓ অন্যান্য ১৩.১৮ শতাংশ

  - ➢ ১৯৯১ সালের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, ২০১১ সালে বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীর হার বেড়েছে। খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীর বৃদ্ধিটা কম। লক্ষণীয়, ২০০১ জনশুমারির প্রতিবেদনে যেহেতু জাতিসত্তার পৃথক পরিচিতি দেওয়া হয়নি, এত ব্যাপকসংখ্যক মুসলিম কারা, সেটা স্পষ্ট নয়। পক্ষান্তরে ২০১১ সালে মুসলিমদের হার অনেকটাই কমে গেছে। বেদেরা মুসলিম, কিন্তু ১৯৯১ ও ২০১১ সালের জনশুমারিতেও আদিবাসী হিসেবে তারা নেই। ২০২২ সালে অবশ্য ‘বেদিয়া’ নামের একটি জাতিসত্তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর কিছু পরিচিতি

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে থাকা তালিকা (২০১৯) অনুসারে ২০২২ সালের জনশুমারিতে জাতিসত্তা ও জনসংখ্যা:

ক্র. ন.	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম	জনসংখ্যা
১	ওরাওঁ	৮৫,৮৫৮
২	কোচ	১৩,৭০৪
৩	কোল	৩,৮২২
৪	খাসিয়া/খাসি	১২,৪২২
৫	খিয়াং	৪,৮২৬
৬	গারো	৭৬,৮৫৪
৭	চাক	৩,০৭৭
৮	চাকমা	৪,৮৩,৩৬৫
৯	ডালু	৩৮৬
১০	তঞ্চঙ্গ্যা	৪৫,৯৭৪
১১	ত্রিপুরা	১,৫৬,৬২০
১২	পাংখোয়া/পাংখো	১,৮৫৭
১৩	খুমি	৩,৭৮০
১৪	বম	১৩,১৯৩
১৫	বর্মণ	৪৪,৬৭১
১৬	মণিপুরী	২২,৯৭৯
১৭	মারমা	২,২৪,২৯৯
১৮	পাহাড়ি/মালপাহাড়ি	৮,৮০১
১৯	মুন্ডা	৬০,২০১
২০	রাখাইন	১১,১৯৭
২১	লুসাই	৩৮০
২২	সাঁওতাল	১,২৯,০৫৬
২৩	হাজং	৭,৯৯৬
২৪	মাহাতো/কুর্মি মাহাতো/বেদিয়া মাহাতো	১৯,২৭১
২৫	কন্দ	১,৮৯৯
২৬	কড়া	৮১৬
২৭	গড়াইত	২,৭৩০
২৮	তেলী	২,০৮২
২৯	তুরি	৩,৭৯৪
৩০	পাত্র	৩,১০৩
৩১	গঞ্জু	৪,১৩৭
৩২	বাগদী	১২,০৯৬
৩৩	বানাই	২,৮৫১
৩৪	বড়াইক/বাড়াইক	৩,৪৪৭
৩৫	বেদিয়া	৭,২০৯
৩৬	ভিল	৯৫
৩৭	ভূমিজ	৯,৬৬৪
৩৮	ভুঁইমালী	১,৯৩০
৩৯	মালো/ঘাসিমালো	১৪,৭৯৭
৪০	মাহালী	৬,৬১৪
৪১	মুসহর	৪,৬০৩
৪২	রাজোয়াড়	২,৩২৭
৪৩	লোহার	৩,৪২০
৪৪	শবর	১,৯৮০
৪৫	হো	২২৪
৪৬	খারিয়া/খাড়িয়া	৩,১০০
৪৭	খারওয়ার/খেড়োয়ার	৩১৪
৪৮	ম্রো	৫২,৪৬৩
৪৯	হুদি	১,৫০৫
৫০	গুর্খা	১০১
৫১	অন্যান্য	৬৮,৫৮৮

ভুলের ফের

আগেই বলেছি, ১৯৯১ সালের জনশুমারির প্রতিবেদনে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা চিহ্নিত করে তাদের জনসংখ্যা দেওয়া ছিল। বলা হয়েছিল, এমন 'উপজাতি' অর্থাৎ জাতিগোষ্ঠী আছে ২৯টি। এদের মধ্যে তিনটি জাতির জন্য দুটি করে নামে হিসাব ছিল। যেমন, ত্রিপুরা ও টিপরা একই জাতি; বংশী ও রাজবংশীও তাই; ম্রো (ম্রু) ও ম্রং (মুরং/ম্রুং) এক। এদের এক করে নিলে সরকারি হিসাবে আদিবাসী জাতির সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ২৬টি। ১৯৯১ সালের জনশুমারির হিসাব এভাবে গুছিয়ে যোগ করে নিয়ে যে তালিকা পাই:

১. চাকমা	২,৫২,৮৫৮	২. সাঁওতাল	২,০২,১৬২
৩. মারমা	১,৫৭,৩০১	৪. ত্রিপুরা	৮১,০১৪
৫. গারো	৬৪,২৮০	৬. মণিপুরী	২৪,৮৮২
৭. ম্রো, মুরং	২২,৩০৪	৮. তঞ্চঙ্গ্যা	২১,৬৩৯
৯. রাখাইন	১৬,৯৩২	১০. কোচ	১৬,৫৬৭
১১. বম	১৩,৪৭১	১২. খাসিয়া	১২,২৮০
১৩. হাজং	১১,৫৪০	১৪. ওরাওঁ	৮,২১৬
১৫. রাজবংশী	৭,৫৫৬	১৬. বুনো	৭,৪২১
১৭. উরুয়া	৫,৫৬১	১৮. মাহাতো	৩,৫৩৪
১৯. পাংখোয়া	৩,২২৭	২০. খিয়াং	২,৩৪৩
২১. মুন্ডা	২,১৩২	২২. চাক	২,১২৭
২৩. পাহাড়ি	১,৮৫৩	২৪. খুমি	১,২৪১
২৫. হরিজন	১,১৩২	২৬. লুসাই	৬৬২

এ ছাড়া, ১৯৯১ সালের জনশুমারি প্রতিবেদনে ২,৬১,৭৪৩ জনকে 'অন্যান্য' হিসেবে দেখানো হয়েছে। নৃবিজ্ঞানীরা বলছেন, এদের মধ্যে কিছু হয়তো বড় কোনো গোষ্ঠীর ছোট অংশ বা শাখা এবং সাবেক ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। এরা হতে পারে– কোল, খন্ড, খারিয়া, ডালু, তুরী, পাহান, বানাই, সিং, পাত্র, বর্মণ, বাগ্‌দি, বেদে, মালো, মাহালি, মুরিয়ার, মুশহর, রাই, রাঁজোয়াড়, হদি, হো প্রভৃতি জনগোষ্ঠী। কিন্তু সেটা স্পষ্ট নয়। নৃবিজ্ঞানীরা বলছেন, এভাবে সরকারি জনশুমারির এ তালিকা পূর্ণাঙ্গ হয়নি। ত্রুটিও আছে। এক জাতিকে আলাদা আলাদা নামে দেখানো ছাড়াও, কোনো কোনো গোষ্ঠীকে বাঙালি হিসেবেও দেখানো হয়েছে।

এদিকে বইপত্রে বলা হচ্ছে যে, বুনো, উরুয়া ও হরিজনদের উল্লেখ শুধু ১৯৯১ সালের জনশুমারিতে আছে। এদের সম্পর্কে আলাদা করে তথ্য চোখে পড়ে না। তবে 'উরুয়া' ওরাওঁদের ভিন্ন নাম হতে পারে, 'হরিজন' বলতে কাদের বোঝানো হচ্ছে, সে প্রশ্ন জাগে।

একাধিক নাম ও শাখা

ভাগ করা সহজ নয়, সেটা বড় সমস্যাঃ

- ✓ আদিবাসীদের কিছু জাতি একাধিক নামে পরিচিত। টিপরা ও ত্রিপুরা, রাজবংশী ও বংশী এবং ম্রো ও ম্রং/মুরং নিয়ে বিভ্রান্তির কথা আগেই বলেছি। একাধিক নামের উদাহরণ আরও আছে। মারমাদের যেমন মগ/মঘও বলা হয়– নামটি অবজ্ঞাসূচক। মুন্ডাদের মুন্ডারিও বলা হয়। গারোরা 'মান্দি' নাম পছন্দ করে। লুসাইরা কুকি বা মিজো নামেও পরিচিত। বম ও পাংখোয়াদেরও বাঙালিরা 'কুকি' বলে। পাংখোয়াদের পাংখোও বলা হয়।
- ✓ বিভ্রান্তি হয় ইংরেজি বানানের জন্যও। 'ওরাওঁ' নামটি যেমন ইংরেজি বানানে 'উরাং' বা 'উরাও'। কেউ কেউ ইংরেজির অনুসরণে সাঁওতালদের 'সান্তাল' লেখেন। ইংরেজিতে খুমিদের 'খামি', 'কামি' এমন বানানেও লেখা হয়। খাসিয়া ইংরেজিতে 'খাসি' এবং পাত্রকে 'পাথর' বা 'পাতর' লেখা হয়।
- ✓ দেখা যায়, কিছু গোষ্ঠী আসলে বড় আরেক গোষ্ঠীর শাখা বা অংশ। মানুষ শাখার নামই বলে। এদিকে নৃবিজ্ঞানীরা বলেন, যাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এক, তারা আসলে একই জাতি। এভাবে অনেক নৃবিজ্ঞানীর মতে যেমন– মারমা এবং পটুয়াখালীর রাখাইন আসলে একই জাতি; তঞ্চঙ্গ্যারা চাকমার একটি শাখা। এঁরা বলেনঃ ডালু, ডালুই, ডুলাই– গারোর অংশ; হো– মুন্ডার অংশ; মাহালি– সাঁওতালের উপ-বিভাগ; পালিয়া– রাজবংশীর একটি শাখা; নর– খাসিয়ার একটি উপ-বিভাগ; রিয়াং– ত্রিপুরাদের একাংশ; সেন্দু– খুমির একটি শাখা। মণিপুরীদের দুই ভাগ বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈ ছাড়াও মুসলিম মণিপুরী আছে। অনেকে 'পাঙন' নাম দিয়ে এদের আলাদা জাতি হিসেবে দেখান। মান্দাই ও বর্মণ বা ক্ষত্রিয়-বর্মণ নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী দুটিকে কোচের শাখাও বলা হয়।
- ✓ জাতি চিহ্নিত করার মাপকাঠি নিয়েও প্রশ্নের অবকাশ আছে। মুসলিম বেদে এবং হিন্দু হয়ে যাওয়া কিছু গোষ্ঠী বাঙালি হিসেবে পরিচিত হতে আগ্রহী। কেউ কেউ বেদে এবং ভুঁইমালী, ভুঁইয়া, গাঙ্গু, জালিয়া (কৈবর্ত), কুকামার, কুর্মি, মালো, নমঃশূদ্র– এমন জাতিগোষ্ঠীগুলোকে সাবেক ক্ষুদ্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আবার, হিন্দু হয়ে যাওয়া কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার আরও কিছু জাতিসত্তাঃ হদি, কাচারি, মিকির ও পাত্র।
    - ➢ তবে নৃবিজ্ঞানীরা এ-ও বলেন, কেউ আলাদা নামে পরিচিত হতে চাইলে সেটা সম্মান করা এবং সেই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। এবং সাবেক গোষ্ঠীগুলোকেও চিহ্নিত করতে হবে। সমতলের আদিবাসীদের অনেকে তেমন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ।

মোটাদাগে কোথায় কোন জাতি

- পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় আদিবাসী বসতি মূলত গড়েছে মোট ১১টি ক্ষুদ্র জাতি। এরা হচ্ছেঃ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, পাংখোয়া, খিয়াং বা খ্যেং, চাক, খুমি ও লুসাই।
    - ✓ বান্দরবান জেলায় এই ১১টি জাতির সবারই দেখা মিলবে।
    - ✓ চাকমারা জনসংখ্যায় দেশের সবচেয়ে বড় আদিবাসী। মারমা ও ত্রিপুরা যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ বৃহত্তম। এ তিন জেলা যেমন এই বড় জাতিগুলোর মূল নিবাস, তেমনি এখানকার ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীগুলোও স্বাতন্ত্র্যের জন্য লক্ষণীয়।

- ✓ এদের মধ্যে চাকদের বান্দরবানেই দেখা যায়। ম্রোদের বড় অংশও সে জেলার বাসিন্দা।
- ✓ ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর অংশবিশেষ চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, চাঁদপুর, মৌলভীবাজার, রাজবাড়ী– এসব জেলাতেও বাস করে।
- ✓ পার্বত্য তিন জেলায় রাখাইন বসতিও দেখা যায়। খুব অল্প সংখ্যায় গুর্খা বা নেপালি উৎসের মানুষও এখানে আছে।

❖ ভাষা ও ঐতিহ্যের যোগসূত্র থেকে ধারণা করা হয়, মারমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের এসব জাতির প্রায় সবাই ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বর্তমান মিয়ানমার, বিশেষ করে আরাকান থেকে ভারত ও বাংলাদেশের এই অঞ্চলে এসেছে। নৃবিজ্ঞানী প্রশান্ত ত্রিপুরা বলছেন, দেশভেদে পরিচিতির অনেক আগে সুদূর অতীতে পুরো অঞ্চলেই মানুষ চলাচল করেছে, বসতি গড়েছে। মারমাদের কেউ কেউ মনে করেন, তাঁরা মিয়ানমার থেকে আসা। 'মারমা' নামটি সে যোগসূত্র দেখায়। ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচলে চাকমা বসতি আছে। ব্রিটিশরা 'হিল টিপেরা' বা ত্রিপুরা বলতে আজকের ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যকে বোঝাত। সে সময় স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের জমিদারি হিসেবে অন্তর্গত ছিল কুমিল্লা ও চাঁদপুরের কিছু অংশ। চট্টগ্রামও অতীতে আরাকান ও ত্রিপুরা শাসনাধীন ছিল।

- উত্তর-বাংলাদেশে বৃহত্তর রাজশাহী ও রংপুরের বেশ কিছু জেলার কিছু অংশে বাস করে সাঁওতাল, ওরাওঁ, রাজবংশী, মাহাতো, মুন্ডা, পাহাড়িয়া, কোল, মালো এবং আরও কিছু ছোট বা সাবেক ক্ষুদ্র জাতি। এসব এলাকা মূলত উত্তর-পশ্চিমের ভারত-সীমান্তবর্তী বা কাছাকাছি জেলা। বগুড়ার মধ্যাঞ্চল, পাবনা এবং কুষ্টিয়াতেও এদের কারও কারও বসতি উল্লেখযোগ্য। এরা সমতলের আদিবাসী।
  - ✓ বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আদিবাসী জাতি সাঁওতালদের দেখা যায় রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, কুষ্টিয়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও ঠাকুরগাঁও জেলায়।
  - ✓ ওরাওঁরা বরেন্দ্র অঞ্চলের বাসিন্দা– দেখা যায় বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। এ ছাড়া, গাজীপুর, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় ওরাওঁ বসতি আছে।
  - ✓ রাজবংশীদের বাস রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুরসহ বৃহত্তর রংপুরের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও ময়মনসিংহ এবং শেরপুর জেলার কয়েকটি অঞ্চলে।
  - ✓ মাহাতোরা মূলত জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, নাটোর, রাজশাহী, নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় বাস করে। বগুড়া, ফরিদপুর ও সিলেটের চা-বাগানেও মাহাতোদের ছোট বসতি রয়েছে।
  - ✓ উত্তর-বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও বৃহত্তর সিলেটের চা-বাগান এলাকায় মুন্ডা বসতি আছে।

❖ সাঁওতাল, মুন্ডা এবং ওরাওঁরা ব্রিটিশ আমলে ভারতের ছোট নাগপুর ও সাঁওতাল পরগনা থেকে এসেছে।

- বৃহত্তর সিলেটে খাসিয়া ও মণিপুরী বড় জাতি। ছোটদের মধ্যে আছে পাত্র। কিছু ত্রিপুরা, গারো, ওরাওঁ, হাজং, মুন্ডা বসতি/বসবাসও আছে।
  - ✓ মণিপুরীদের বসবাস মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট ও সুনামগঞ্জের সমতলে। বড় বসতি মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায়; এখানেই মুসলিম অংশটিরও দেখা মেলে। সীমান্তের ওপারে ভারতের মণিপুর, আসাম, ত্রিপুরা, আগরতলায় মণিপুরী জাতি আছে।
  - ✓ খাসিয়াদের বসবাস মূলত এগারোটি উপজেলায়। এগুলো হচ্ছে: সিলেটের ভারত সীমান্তবর্তী জৈন্তাপুর, কানাইঘাট ও গোয়াইনঘাট; মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, রাজনগর, কুলাউড়া ও বড়লেখা; হবিগঞ্জের চুনারুঘাট ও বাহুবল; এবং সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলায়।
  - ✓ পাত্রদের দেখা মেলে সিলেট শহরের উত্তর-পূর্বে, খুব কাছেই। এ অঞ্চলে ত্রিপুরারা আছে মৌলভীবাজার জেলায়।

মোটাদাগে ৪৫ জাতি

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত আদিবাসী জনগোষ্ঠী (বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫) বইটির তথ্য অনুযায়ী, মোটাদাগে ৪৫ আদিবাসী জাতি এভাবে বিন্যস্ত:

- ➢ **পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল:** খিয়াং, খুমি, চাক, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, পাংখোয়া, বম, মারমা, ম্রো, রাখাইন, লুসাই– মোট ১২টি।
- ➢ **উত্তরাঞ্চল:** ওরাওঁ, নুনিয়া, পলিয়া, পাহান, ভুঁইমালী, মাহাতো, মাহালি, মুন্ডা, মুশহর, রবিদাস, রাঁজোয়াড়, রাজবংশী, রানা কর্মকার, লহরা, সাঁওতাল– মোট ১৫টি।
- ➢ **ময়মনসিংহ-সিলেট অঞ্চল:** কন্দ, কুর্মি, কোচ, খাড়িয়া, খাসিয়া, গারো, ডালু, নায়েক, পাঙন, পাত্র, বর্মণ, বীন, বোনাজ, ভূমিজ, মণিপুরী, শবর, হাজং, হালাম– মোট ১৮টি।

- ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইলসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহের জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা ইত্যাদি জেলায় বড় জাতি গারো। তারপর আছে কোচ ও হাজং। ভারতের মেঘালয়ের গারো পাহাড় অঞ্চলে এ জাতির আদি নিবাস।
  - ✓ বাংলাদেশে গারোদের মূল বসতি হালুয়াঘাট উপজেলাসহ ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনার ভারত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এবং টাঙ্গাইলের মধুপুর গড়াঞ্চলে। এখানে কোচ, হাজং, রাজবংশী এবং ডালু, বর্মণ (ক্ষত্রিয়), বানাই, হদি প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বাসও আছে।
  - ✓ এ ছাড়া, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলায় গারোদের দেখা মিলবে।
  - ✓ বৃহত্তর ময়মনসিংহ ছাড়াও বৃহত্তর সিলেটে হাজংদের বসতি আছে।

❖ ভাষার মিল থেকে ধারণা করা হয়, গারো, খাসিয়া, মণিপুরী, রাজবংশী এবং কোচ জাতিসত্তারা আদিতে ছিল বর্মা থেকে তিব্বত অব্দি বিস্তৃত অঞ্চলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাসিন্দা। কয়েক হাজার বছর আগে থেকে এদের অনেকে আজকের আসাম এবং তার আশপাশের এলাকার বাসিন্দা ছিল। বিভিন্ন সময়ে এরা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

✓ বরগুনা ও পটুয়াখালীতে বড় আদিবাসী বসতি রাখাইনদের।

✓ এ ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারেও কিছু রাখাইন আছে।

❖ রাখাইনেরা এসেছে আরাকান থেকে। প্রশান্ত ত্রিপুরা জানাচ্ছেন, এদেরই জাতভাই মারমাদের কেউ কেউ অবশ্য নিজেদের উৎপত্তিস্থল হিসেবে মিয়ানমারের নাম বলেন।

- দক্ষিণ-পশ্চিমে বৃহত্তর খুলনা-যশোর এলাকায় কিছু সাবেক-ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের বড় বসতি চোখে পড়ে। বেদে জাতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অনেক এলাকায়।

কম করে গোনা?

নৃবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময় সরকারি গণনায় পাওয়া আদিবাসী জনসংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা বলেন, ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের জনসংখ্যা এগুলোর চেয়ে বেশি হওয়া সম্ভব। যেমন, ১৯৯১ সালের জনশুমারি পুরো টাঙ্গাইল জেলায় ‘উপজাতীয়’ জনসংখ্যা বলেছিল ১৪,০৮২। ২০০১ সালের জনশুমারি গুনেছে ১৭,৪৬২। অথচ মধুপুর জাতীয় উদ্যানের ভেতরে ও আশপাশের ৩০টি গারো গ্রামের ১০টির নমুনা জরিপ করে প্রয়াত নৃবিজ্ঞানী কিবরিয়াউল খালেক ১৯৯২ সালেই লিখেছিলেন, কেবল মধুপুর গড়াঞ্চলেই আদিবাসীদের সংখ্যা হবে ২৫,০০০। বইপত্রে পাওয়া সরকারি ও বেসরকারি শুমারির ব্যাপক পার্থক্যের আরেকটি নজির: ১৯৮১ সালের মার্চে বিবিএসের মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিনে রাজশাহীর পাঁচ জেলায় আদিবাসীর সংখ্যা বলা হয় ৬২,০০০। কিন্তু খ্রিষ্টান মিশনগুলোর শুমারিতে এর দ্বিগুণ জনসংখ্যা দেখায়। সরকারি গণনায় ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। সরকারি কাগজপত্রে এমনিতেই খ্রিষ্টান আদিবাসীদের ‘খ্রিষ্টান’ এবং বাংলা পদবি ব্যবহারকারীদের ‘হিন্দু’ হিসেবে চিহ্নিত করার নজির আছে।

মোটাদাগে জাতিভেদে ধর্ম:

- **বৌদ্ধ:** মারমা, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, রাখাইন; পার্বত্য চট্টগ্রামের আরও কিছু ক্ষুদ্র জাতি। খুব অল্পসংখ্যক ম্রোও বৌদ্ধধর্মের অনুসারী।
- **হিন্দু:** ত্রিপুরা, মণিপুরী, কোচ, হাজং, পাত্র, সমতলের আরও কিছু জাতি এবং অনেকগুলো সাবেক ক্ষুদ্র জাতিসত্তা।

- **সর্বপ্রাণবাদী, নিজস্ব ধর্ম:** সাঁওতাল– স্পিরিট বা আত্মানির্ভর বিশ্বাস। তবে হিন্দু প্রভাব আছে এবং কিছু খ্রিষ্টান হয়েছে। খাসিয়াদেরও একই পরিস্থিতি। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছোট গোষ্ঠীগুলো সর্বপ্রাণবাদী ছিল। কিন্তু এখন অনেকে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত। অন্যদিকে আদিতে ম্রোদের কোনো পোশাকি ধর্ম ছিল না। ১৯৮০-র দশকে মেনলে ম্রো নামে এক কিশোর-চিন্তাবিদ তাদের জন্য ক্রামা নামে ধর্ম প্রবর্তন করেন। এখন অধিকাংশই সে ধর্ম পালন করে।
- **খ্রিষ্টান:** সংখ্যাগরিষ্ঠ ত্রিপুরা হিন্দু হলেও, কেউ কেউ খ্রিষ্টান। বান্দরবানের অধিকাংশ ত্রিপুরাই তাই। গারোদের সর্বপ্রাণবাদী ধর্ম ছিল। এখন প্রায় সবাই খ্রিষ্টান। বম, লুসাই এবং পাংখোয়াদের অধিকাংশ বা প্রায় সবাই এখন খ্রিষ্টান। খিয়াং, ম্রো এবং খুমিদেরও কেউ কেউ খ্রিষ্টান।
- **মুসলিম:** বেদে; মণিপুরীদের ছোট একটি অংশ, 'পাঙন' নামে পরিচিত।

ভাষার মিল ও স্বাতন্ত্র্য

নৃবিজ্ঞানীরা বলছেন, নরগোষ্ঠী বা রেস ধরে বিভাজন মানুষের অর্থবহ পরিচিতি নয়; বরং যেকোনো জাতির উৎপত্তি ও পরিচয় বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিত্তি হচ্ছে তার ভাষাগত পরিচিতি। শব্দভান্ডারের তুলনা করে একই উৎস থেকে উদ্ভূত ভাষাগুলোকে একেকটি পরিবার বলা হয়। ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের ভাষার পরিবারভুক্তি দেখলে এদের কাছে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ঋণ যেমন চোখে পড়ে, তেমনি এদের স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টিও পরিষ্কার হয়। সংক্ষেপে চিত্রটি এমন:

১. **তিব্বতি-বর্মি বা ভোট-বর্মি ভাষা পরিবার:** এই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আছে তিব্বতি ও বর্মী ভাষা এবং নেপাল, ভুটান ও ভারতের আদিবাসী-অধ্যুষিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর অধিকাংশ ভাষা। কুকি-চিন এবং বোড়ো এর দুটি ভাগ। কুকি-চিন গোত্রের সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বম, খুমি, খিয়াং, লুসাই, মণিপুরী (মৈতৈ), মারমা, ম্রো, পাংখোয়া এবং চাক ভাষাগুলো। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের পুরোনো ভাষাও হয়তো কুকি-চিনের অন্তর্গত ছিল। বনযোগী ও সেন্দুদের ভাষাও এই পরিবারের। বোড়ো গোত্রের সদস্য: গারো, কোচ, ত্রিপুরা, রাজবংশী প্রভৃতি ভাষা। এ ছাড়া আরও আছে ডালু, হদি, কাচারি, মিকির, পালিয়া, পাত্র, রিয়াংদের ভাষা। হাজংদের পুরোনো ভাষা বোড়ো গোত্রের ছিল।

২. **অস্ট্রো-এশিয়াটিক:** দুই প্রধান শাখা– মুন্ডা ও মন-খ্মের। মুন্ডাদের ভাষা মুন্ডারি ছাড়াও মুন্ডা শাখায় আছে সাঁওতাল, (মাহালি, হো) প্রভৃতি ভাষা। মন-খ্মের শাখার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বার্মার মন্ ও কম্বোডিয়ার খ্মের ভাষা। ভারতীয় উপমহাদেশে এ পরিবারে পড়ছে শুধু খাসিয়া ভাষা।

৩. **দ্রাবিড় ভাষা পরিবার:** তামিল, মালয়ালম, তেলেগু প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা। ওরাওঁ ও পাহাড়িয়া ভাষা এ পরিবারভুক্ত।

৪. **ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার:** বাংলা এই পরিবারের সদস্য। নৃবিজ্ঞানীরা বলছেন, আদিতে হয়তো চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা ও হাজংদের ভাষাগুলো তিব্বতি-বর্মি উৎসের ছিল। তবে এখন এরা যেসব ভাষা ব্যবহার করে, সেগুলোর সঙ্গে বাংলার অনেক মিল আছে। সে হিসেবে এখন তাদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের সদস্য। আবার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের ভাষাকেও অহমিয়া, উড়িয়া ও বাংলা

ধাঁচের বলে মনে করা হয়। তাই সেটা এই পরিবারে পড়বে। বেদে, ভুঁইমালী, ভুঁইয়া, গাঙ্গু, জালিয়া-কৈবর্ত, কুকামার, কুর্মি, মাল্লা, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির ভাষা এ পরিবারে পড়ে।

বাংলার শিকড়: নৃবিজ্ঞানীরা বলেন, বাংলা ভাষাভাষী এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের ভাষা ছিল মুন্ডা-গোত্রীয় অস্ট্রো-এশিয়াটিক পরিবারের। এদের কাছ থেকে বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণের কিছু ভিত্তিসহ এর 'দেশি' শব্দগুলো এসেছে। সাঁওতাল বা মুন্ডাদের সুতরাং 'বহিরাগত' বলার কোনো সুযোগ নেই। তারা বাংলা ও বাঙালির বৃহত্তর ঐতিহ্যের ভিত্তি। একইভাবে কিছু 'দেশি' শব্দ তিব্বতি-বর্মি ভাষাগুলোর কাছ থেকে পাওয়া। বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপেও তিব্বতি-বর্মি, বিশেষ করে এর বোড়ো শাখার প্রভাব দেখা যায়।

পারস্পরিক লেনদেন: অন্যদিকে এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিছু গোষ্ঠী ছাড়া প্রায় সবাই বাংলা ও নিজস্ব ভাষা– দুটোতেই অভ্যস্ত। রাজবংশী, পাহাড়িয়া, কোচ বা পাত্ররা নিজেদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে; তারা এখন নিজেদের মধ্যেও বাংলায় কথা বলে। ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান জাতিগুলোর ওপর ইংরেজির প্রভাব দেখা যায়। বেশ কিছু আদিবাসী ভাষা অন্য ভাষার লিপি নিয়েছে: বাংলা লিপি– ত্রিপুরা ও মণিপুরী; বর্মী লিপি– চাকমা ও মারমা; রোমান লিপি– সাঁওতাল, গারো, লুসাই ও আরও কিছু ভাষা। তবে অনেক ত্রিপুরা রোমান লিপি ব্যবহার করতে পছন্দ করেন।

রবিদাস

রবিদাসেরা নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং বাঙালি সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। নারায়ণের পূজারী রবিদাসদের জাতির নাম তাদের ধর্মগুরুর নামে। এদের আদি পেশা চর্মকার। অনেকে চামড়ার কাজের ওপর নির্ভর করলেও এরা এখন বিভিন্ন শ্রমজীবী। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫ বইটি বলছে, এদের সবচেয়ে বড় অংশ বাস করে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরে। বৃহত্তর সিলেটের মালনীছড়া, লাক্কাতুরা, আলীবিহার ও মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের আলীনগর, শমশেরনগর, পুঠিয়াছড়া ও হবিগঞ্জে তাদের বড় বসতি আছে। খুলনা-যশোরসহ দেশের অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলেও তাদের দেখা যায়। রবিদাস সমাজের দুই সদস্যের বরাত দিয়ে বইটি তাদের সংখ্যা বলছে, ১ লাখ ২৮ হাজার।

সমতলবাসী ক্ষুদ্র জাতিসত্তা

বৃহত্তর ময়মনসিংহের গারোরা বিভিন্ন কারণে, বিশেষ করে গড়াঞ্চলে তাদের সঙ্গে বন নিয়ে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং রাজধানী ঢাকার সঙ্গে নৈকট্যের সুবাদে, সংবাদমাধ্যমে কিছুটা স্থান পায়। মণিপুরীদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির খবর সংবাদমাধ্যমে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু স্থান পায়। এরা বাদে সমতলবাসী অন্য কোনো ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কথা সংবাদমাধ্যমে প্রায় দেখাই যায় না। বাংলাদেশে আদিবাসীদের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি সমতলবাসী সাঁওতালেরা। সাঁওতাল বিদ্রোহের দিবস এলে হয়তো তাদের কথা সংবাদমাধ্যমের মনে পড়ে। অথবা দিনাজপুরের কয়লাখনি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক উঠলে তাদের নাম ওঠে।

ওপরে পাহাড়ি ক্ষুদ্রতর জাতিসত্তাগুলোর নাম পাবেন। সব কটি ক্ষুদ্রতর জাতিসত্তা সাধারণভাবে বঞ্চিতর মধ্যে অধিকতর বঞ্চিত। আর দু-একটি অপেক্ষাকৃত বড় জাতির কিছু অংশের কথা বাদ দিলে সমতলবাসী সব আদিবাসীরই অবস্থা সে রকম। এক অর্থে এদের সমস্যাগুলো হয়তো গভীরতর। সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর একেবারে গা ঘেঁষে বসবাস করায় জমি নিয়ে এদের দ্বন্দ্ব ও বঞ্চনা প্রকটতর। সমতলের অনেক আদিবাসী ক্ষুদ্র জাতিসত্তা খুব ছোট। এ ছাড়া, অনেকগুলো জাতিই নিত্য ওঠাবসায় বাঙালি সমাজের রীতি-নীতি-ধারার প্রবল প্রভাব এড়াতে পারেনি।

অনেকে তারা সাবেক ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। কেউ অনেক দিন থেকে, কেউ অল্পদিন হয় বাঙালি সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠী হিসেবে নজরের আড়ালে চলে গেছে। সমতলের আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য হারানোর এ প্রক্রিয়া দ্রুত চলমান। কোণঠাসা হতে হতে অস্তিত্বের সংগ্রামে অনেকেই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে এবং খ্রিষ্টান মিশনারিদের সাহায্যে লেখাপড়া শিখে জীবিকার উপায় খুঁজছে। গারোদের প্রায় সবাই এখন খ্রিষ্টান। অনেক জাতি আবার বাঙালি সমাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু তাদের ঠাঁই হয়েছে একেবারে প্রান্তে, অস্পৃশ্যতার ভুক্তভোগী নিম্নবর্ণের মধ্যে অথবা চতুর্বর্ণের বাইরে। এদের অনেক জাতিই এখনো নিজেদের আদি কিছু আচার-অনুষ্ঠান কমবেশি পালন করে।

ওপরে যেমনটা দেখেছি, সাঁওতালেরাসহ সমতলবাসী আদিবাসীদের বড় একটি অংশ উত্তর-বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। উত্তরাঞ্চলের চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এরাও আছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা সাক্ষরতা– দুই দিক থেকে এরা অনেক পিছিয়ে। আদিবাসী গ্রামগুলোতে সুযোগ-সুবিধার অভাব যেমন প্রকট, তেমনি এখনো এরা জাদুকর বা ওঝা ও টোটকা চিকিৎসকের ওপর নির্ভরশীল।

এদিকে সাঁওতাল, মুন্ডা এবং ওরাওঁরা ভারতের ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনা থেকে এ ভূখন্ডে এসেছে ব্রিটিশ আমলে। সুতরাং এদের 'আদিবাসী' স্বীকৃতি নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডাও বেশি। একই রকম বিতর্কের মধ্যে আছে বৃহত্তর সিলেটের চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীরা। চা-বাগান প্রতিষ্ঠার সময় তাদের ভারত থেকে এই অঞ্চলে এনে বসতি করিয়েছিল ব্রিটিশ মালিকেরা। তাদের আনা হয়েছিল বিহার, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ– এসব জায়গা থেকে। এরা মূলত আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ। চা-জনগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু জাতিগোষ্ঠীঃ মুন্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল, মাহালি, বিন্দ, বাউরি, মাহাতো, বরাইক, গঁড়, দাল ও কাহার। বাংলাদেশে এরা ক্ষুদ্র জাতিসত্তা পরিচিতির দাবিদার। উপত্যকাবাসী হিসেবে এরাও সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে পড়বে। আরও কিছু জাতির হদিস পাবেন আলাদা আলাদা বক্সে।

এ ছাড়া, সমতলের আদিবাসী জাতিদের কিছু সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠানের কথা পাবেন সে-সংক্রান্ত তালিকায়। তবে সাংবাদিককে শুধু সেসব বিষয়ে নজর দিলে চলবে না, এদের সমস্যা-বঞ্চনাগুলো তুলে ধরায় মন দিতে হবে। এবং সমতলবাসী সব কটি আদিবাসী জাতিসত্তার কথাই বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

সমতলের ছোট্ট কিছু জাতিসত্তা

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত আদিবাসী জনগোষ্ঠী বইটি থেকে সমতলবাসী কয়েকটি ছোট্ট এবং/অথবা সাবেক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার হদিস দেব।

পালিয়াঃ অনেক নৃবিজ্ঞানীর মতে, পালিয়ারা রাজবংশীদের একটি শাখা। এদের নিবাস বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী জেলায়। ধর্মে হিন্দু। দুর্গা বড় দেবী।

পাহানঃ পাহান জাতির মানুষেরা বসবাস করে মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার এলাকায়। পাহানেরা মূলত নিজস্ব সনাতন বিশ্বাস অনুসারী, তবে হিন্দু আচার ও পূজা-পার্বণও তারা পালন করে।

ভুঁইমালীঃ ভুঁইমালীদের বসবাস মূলত জয়পুরহাটের কাছে পাথুরিয়া গ্রামে। এ গ্রাম-সংলগ্ন যমুনা নদীর অন্য পারেও কিছু ভুঁইমালী বাস করে। এরা নিজেদের নিম্নবর্ণের বাঙালি হিন্দু বলে মনে করে।

মাহালিঃ অনেক নৃবিজ্ঞানীর মতে, মাহালিরা সাঁওতালদের একটি উপবিভাগ। মাহালিরা বাস করে উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলায়। ধারণা করা হয়, মাহালিরা খ্রিষ্টান হতে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে। এখন এদের প্রায় সবাই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। যারা খ্রিষ্টান হয়নি, তারা হিন্দুধর্মের কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। তবে হিন্দুধর্মের সবচেয়ে নিচের বর্ণেও তাদের ঠাঁই হয়নি।

মুশহরঃ মুশহর নামে পরিচিত মানুষেরা বাংলাদেশে এসেছে ভারতের বিহার রাজ্যের আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে। এরা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বাস করে। এশিয়াটিক সোসাইটির বইটি এদের সংখ্যা অনুমান করছে ৩ হাজার। এরা ধর্মবিশ্বাসে হিন্দু; হোলি সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব।

রাঁজোয়াড়ঃ রাঁজোয়ারদের বসতি একটি গ্রামে সীমিত– জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার নাকরিয়া। গ্রামটি ছোট যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। লৌকিক দেব-দেবীর পাশাপাশি তারা হিন্দু দেব-দেবীদেরও পূজা করে।

লহরাঃ সনাতন ধর্মাবলম্বী লহারা জাতির বড় বসতি জয়পুরহাট শহরের কাছে এবং সে জেলার সদর উপজেলায় ভাদসা ইউনিয়নের ইয়াকপুর গ্রামে। এ ছাড়া, রাজশাহী ও নাটোরে কিছুসংখ্যক লহরার দেখা যায়। সনাতন ধর্মাবলম্বী লহরাদের বড় দেবতা নারায়ণ। সব শুভ কাজে নারায়ণের পূজা করা হয়। প্রতি লহরা বাড়িতে বছরে অন্তত একবার নারায়ণপূজা করতেই হয়।

আদিবাসী সংস্কৃতি

সাঁওতাল

- ✓ সোহরাই/সহরায় উৎসব: সবচেয়ে বড় উৎসব। আমন ধান ঘরে তুলে ফসলের দেবতাকে ধন্যবাদ জাানানোর উৎসব। হয় পৌষ-মাঘ মাসে।
- ✓ বাহা পরব: ফাল্গুন মাসের এই উৎসব সাঁওতালদের খুবই প্রিয়। মূলত এটা বসন্ত উৎসব।
- ✓ দাঁসায় উৎসব ও নৃত্য: অতীতে আদিধর্মের একটি বিশেষ উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান ও নাচ হতো। এখন দুর্গাপূজার সময় এই নৃত্য পরিবেশিত হয়।
- ✓ সারজম উৎসব: শাল ফুল ফুটলে ঐতিহ্যবাহী এই পরব হয়। শালগাছ বাঁচানোর জন্য বনদেবীর সঙ্গে তাদের বিয়ে দেওয়া হয়।
- ✓ এরো উৎসব: আষাঢ়-শ্রাবণে বীজ বোনার উৎসব।

ওরাওঁ

- ✓ কারাম উৎসব: সবচেয়ে বড় উৎসব। কারামগাছকে তারা রক্ষাকর্তা মানে। তার প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা মনে করতে এই উৎসব করা হয়। এটা হয় ভাদ্র মাসে।
- ✓ সারহুল উৎসব: চৈত্র মাসে গাছের নতুন পাতা বেরোলে এই উৎসব হয়। এ সময় গ্রাম রক্ষাকারী আত্মাকে স্মরণ করে পূজা দেওয়া হয়। এর আরেক তাৎপর্য সূর্য ও পৃথিবীর বিয়ে।
- ✓ ফাগুয়া উৎসব: নববর্ষ। ফাল্গুনকে বছরের প্রথম মাস গণনা করে এই উৎসব করা হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। প্রচুর আবির ছড়ানো হয়।
- ✓ সোহরাই উৎসব: কার্তিক মাসে অমাবস্যায় (হিন্দুদের দীপাবলি উৎসবের দিন) আলো জ্বালিয়ে ঘর-গোয়াল সাফসুতরো করে।
- ✓ খারিয়ানি উৎসব: অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান মাড়াইয়ের জায়গাকে পবিত্র করার জন্য এই উৎসব।
- ✓ ডান্ডা কাটনা: যেকোনো ভালো কাজের আগে এই উৎসব করা হয়।

রাজবংশী

- ✓ তুলসীপূজা: বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন বছরজুড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ পূজা হয়।
- ✓ মদনকাম বাঁশখোলা: বৈশাখ মাসের এ পূজা ও উৎসবে রঙিন কাপড়ে মোড়া বাঁশের খণ্ড নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ ও নাচ-গান করা হয়। এটা কালীপূজার মতো। রাজবংশীরা শীতলা দেবীর বদলে এ পূজা করে।

- ✓ বিষহরির পূজা: প্রায় সব অনুষ্ঠানে বিষহরি ঠাকুরানির পূজা করা হয়।
- ✓ ধানকাটার পূজা: অগ্রহায়ণ মাসের পয়লা এ পূজা তারিখে করা হয়। পরিবারের কর্ত্রী সিঁদুর ও প্রদীপ নিয়ে খেতে গিয়ে সিঁদুর ছড়িয়ে কিছু ধান কেটে ঘরে আনেন।
- ✓ বারুণী স্নান: মাঘ মাসে করতোয়া নদীর তীরে রাজবংশীরা এ পুণ্যস্নান করে।

মাহাতো

- ✓ সহরায় উৎসব: প্রধান উৎসব। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে গৃহপালিত পশুর মঙ্গলের জন্য করা হয়; অশুভ শক্তি নাশ করাও উদ্দেশ্য থাকে।
- ✓ কারাম উৎসব: ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর দিনে ওরাওঁদের মতো কারামগাছের ডালকে পূজা করা হয়।
- ✓ সূর্যপূজা: মাঘ মাসে করা হয়
- ✓ পূষনা উৎসব: পৌষ মাসের শেষ দিনে বা সংক্রান্তিতে এই উৎসব হয়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা হয়।

হাজং

- ✓ বাস্তুপূজা: প্রতি গ্রামে বাস্তুমন্দির থাকে, পৌষসংক্রান্তির দিনে সেখানে পূজা হয়; হাজংদের সবচেয়ে আনন্দের উৎসব।
- ✓ মনসাপূজা: শ্রাবণের মধ্যভাগে মনসাপূজা হয়। কবিয়ালেরা গীত রচনা করেন।
- ✓ দোলযাত্রা: ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সবাই দোল উৎসব পালন করে।

মুন্ডা

- ✓ গ্রামপূজা: সবচেয়ে বড় ও জাঁকজমকের পূজা। তবে আজকাল সব জায়গায় এ পূজা করা হয় না।
- ✓ কারামপূজা: ভাদ্র মাসে কারামগাছের ডাল কেটে এনে এরাও পূজা করে।
- ✓ মনসাপূজা: সাপের মূর্তি-সংবলিত মাটির ঘট তুলে ভাদ্র মাসে এ পূজা করা হয়।

রবিদাস

- ✓ মাঘী পূর্ণিমা: এদের প্রধান উৎসব। দিনটি তাদের ধর্মগুরু রবিদাসের জন্মতিথি।
- ✓ দেওয়ালি পূজা: কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজার দিন এই উৎসব হয়। দোলপূর্ণিমা, বাসন্তীপূজা, শিবরাত্রি– এরা এসব পূজাও করে।

রাঁজোয়াড়

- ✓ ডালপূজা: ভাদ্র মাসের একাদশী তিথিতে কুমারী মেয়েরা বিভিন্ন রকমের শস্যদানা নিয়ে পূজা করে।
- ✓ নারায়ণপূজা: বৈশাখ মাসে করা হয়। অন্তত বছরে একবার করতেই হয়।

- ✓ বিষহরির পূজা: শ্রাবণের শেষ দিন সাপের মূর্তি বসানো ঘট দিয়ে এ পূজা করা হয়।
- ✓ পৌষনা: পৌষ মাসের শেষ দিন নানা রকম পিঠা তৈরি করে সবাইকে খাওয়ানো হয়।
- ✓ সন্ন্যাসীমেলা: চৈত্রের শেষ দিন ও বৈশাখের প্রথম দিন এ পূজা করা হয়।

গারো

- ✓ জুম বা চাষাবাদকে কেন্দ্র করে তাদের বড় উৎসবগুলো আবর্তিত।
- ✓ ওয়ানগালা উৎসব: ঐতিহ্যবাহী সবচেয়ে বড় এবং জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব হলো ওয়ানগালা। জুমের প্রথম ফসল খাওয়ার আগে তারা এ উৎসব করত। এখনো প্রতীকীভাবে অক্টোবর মাসের শেষে বা নভেম্বর মাসে এই উৎসব করা হয়।
- ✓ জামে গাপ্পা-আহাওয়া: জুম খেতে ধান কাটার আগের উৎসব। ধান কাটার মৌসুমে এটা পালিত হয়।
- ✓ শিশুর জন্মের অনুষ্ঠান: শিশু জন্ম নিলে পুরো গ্রামের সবাই আনন্দ করে।

মণিপুরী

- ✓ রাস উৎসব: সবচেয়ে বড় কার্তিকের পূর্ণিমায় উদ্‌যাপিত মহা রাসলীলা মণিপুরীদের সবচেয়ে বড় উৎসব। গ্রামে গ্রামে মহাসমারোহে নৃত্যগীত সহযোগে এই উৎসব পালন করা হয়।
- ✓ বিষু উৎসব: বর্ষবিদায় উৎসব।
- ✓ সংক্রান্তি উৎসব: পৌষপার্বণ
- ✓ মণিপুরীদের যেকোনো উৎসব তাদের সমৃদ্ধ নৃত্য-গীতকলার জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য পায়।

খাসিয়া

- ✓ নাচ তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের অংশ। বিভিন্ন উপলক্ষে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।
- ✓ কুমারী নৃত্য: বসন্তের শুরুতে প্রকৃতিকে খুশি করতে অবিবাহিত তরুণ-তরুণীরা এ নৃত্যে যোগ দেন।
- ✓ ফসল তোলার নৃত্য: বীজ বোনা, মাটির উর্বরতা কামনা থেকে শুরু করে ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গ থাকে নাচ।
- ✓ নংখ্রেম নাচ: খাসিয়ারা সব জনগোষ্ঠী একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে সম্মিলিতভাবে বছরে একবার এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

চা-জনগোষ্ঠী

- ✓ এদের মধ্যে অনেকগুলো জাতি থাকায় নানা রকম পূজা-উৎসব দেখা যায়।
- ✓ বাঁধনা, নয়াখানি, জিতিয়া, কারাম, ভাইফোঁটা, সোহরাই, সাকরাৎ, বাহা পরব, টুসু, ডান্ডাকাটনা, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ।
- ✓ ছট: কার্তিক মাসের শুক্ল ও সপ্তমী তিথিতে হয় ছট পরব। এ পরব বিহারের বড় উৎসব।
- ✓ টুসু: শস্যের দেবী। পৌষ মাসে এঁর উদ্দেশে মুন্ডা, কুর্মি ও মাহাতোরা ব্রত পালন করে।

চাকমা

- ✓ বিজু বা বিহু উৎসব: সবচেয়ে বড় উৎসব বিজু– চৈত্রসংক্রান্তি ও বর্ষবরণ উৎসব চৈত্র মাসের শেষ দুদিন এবং নতুন বছরের প্রথম দিন উদ্‌যাপিত হয়।
- ✓ হাল-পালনি ও মা-লক্ষ্মী-মা পূজা: অন্যতম উৎসব। একে দ্বিতীয় বিজু বলে। আষাঢ় মাসের ৭ তারিখ ফসল ও ঐশ্বর্যের দেবী মা-লক্ষ্মী-মাকে মুরগির ডিম এবং কাঁকড়া দিয়ে পূজা দেওয়া হয়। ওই দিন হালের গরুদেরও বিশ্রাম দেওয়া হয়।

মারমা

- ✓ সাংগ্রাই (নববর্ষ): প্রধান সামাজিক উৎসব। বর্মী সনের চৈত্র মাসের শেষ দুদিন ও নতুন বছরের দিন এই উৎসব হয়। বিজু বা বাঙালির চৈত্রসংক্রান্তি ও পয়লা বৈশাখের সময়ে এটা হয়।
- ✓ ওয়া-গ্যায়-আঁকা: প্রবারণা পূর্ণিমার এই উৎসব মারমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব।

ত্রিপুরা

- ✓ বৈসু/বৈসুক: ত্রিপুরাদের প্রধান জাতীয় উৎসব। এটি তাদের বর্ষবরণের দিন। এটি অত্যন্ত পুণ্যদিনও বটে। এই উৎসবের দিনগুলোতে প্রেম ও কর্মের দেবতা গরিয়ার নামে গরিয়া উৎসব হয়। বিজু ও সাংগ্রাইয়ের সময়ে এটা হয়।
- ✓ কেরপূজা: এটি একটি সর্বজনীন উৎসব। শকাব্দের শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষের প্রথম শনি ও মঙ্গলবার এটা করা হয়। কের অর্থ গন্ডি বা বেষ্টনী। মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ পূজা করা হয়।
- ✓ কাথারক (বোতল) নৃত্য: কাথারক অর্থ পবিত্র। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে মাঙ্গলিক কাথারকপূজা ও উৎসব হয়। ভালো কাজের জন্য কাথারকপূজার সময় বোতলের ওপর দীপশিখা জ্বালিয়ে মাথায় নিয়ে মাঙ্গলিক নৃত্য করা হয়।

তঞ্চঙ্গ্যা

- ✓ বিসু: তাদের প্রধান এই উৎসব নববর্ষের।

খিয়াং

- ✓ সাংলান: সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। বিজু ও সাংগ্রাইর মতোই বর্ষবরণ উৎসব।
- ✓ হেনেই: জুম ফসল তোলার পর পালন করা হয়। বছরে তিনবার এই উৎসব করা হয়।
- ✓ বুগেলে: জুমে ধানের বীজ বপনের পর ভালো ফসলের আশায় এই অনুষ্ঠান করা হয়।

চাক

- ✓ সাংগ্রাই: বর্ষবরণ উৎসব। পাঁচ দিন ধরে হয়।
- ✓ নবান্ন উৎসব: জুমের প্রথম ধান কাটার পর এই উৎসব হয়।

বম

- ✓ প্রায় সবাই খ্রিষ্টান। বর্ষবিদায়, বর্ষবরণ, নবান্ন তাদের বড় উৎসব। প্রথম দুটি ইংরেজি মাস অনুসারে হয়। নবান্ন হয় জুমের ফসল ওঠার পরে।

ম্রো

- ✓ রাইক্ষারাম: এটা কান ফোঁড়ানোর উৎসব। তিন বছর বয়সে এ কর্ম সম্পাদন করে শিশুকে জাতিতে ওঠানো হয়।
- ✓ ছিয়াছত-প্লাই বা গোহত্যা উৎসব: ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে জুমের ফসল ওঠানোর পর অবস্থাপন্ন ম্রো পরিবার এই উৎসব আয়োজন করে। এতে একটি গরুকে প্রতীকীভাবে হত্যা করা হয়। ম্রোদের আদিতে বিশ্বাস ছিল, গরু তাদের জন্য পাঠানো ধর্ম-লেখা কলাপাতাটি খেয়ে ফেলেছিল।
- ✓ চাম্পুয়া উৎসব: বনে গিয়ে কলাপাতা বা চাম্পুয়া কেটে আনার উৎসব। গোহত্যা উৎসবের বিশ্বাসের সঙ্গে এর মিল আছে।

লুসাই

- ✓ চাপচারকূত: বসন্ত উৎসব। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব হয়।
- ✓ মীমকূত: আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে মৃত আত্মাদের স্মরণে পালন করা হয়।
- ✓ পলকূত: শস্য কাটা উপলক্ষে এই উৎসব করা হয়।

রাখাইন

- ✓ সাংগ্রেং পোয়ে: বর্ষবরণ উৎসব। চাকমা, ত্রিপুরা ও মারমাদের বর্ষবরণের সমসাময়িক।

আদিবাসী-সংশ্লিষ্ট কিছু আইন, নীতিমালা ও পরিকল্পনা

বাংলাদেশ

সংবিধান: সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি) ধারা ২৩ক-এ উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বলা আছে, রাষ্ট্র এদের 'অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন'। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ২০১১ সালে এই ধারা যুক্ত করা হয়।

অন্যান্য আইন: কিছু আইন/নীতিমালায় আদিবাসীদের উল্লেখ বা তাদের ওপর প্রভাব ফেলার মতো বিধান আছে। এগুলোর মধ্যে পড়ছে ভূমি এবং বন ও পরিবেশ-সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা; পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ কিছু আইন; চা-শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট আইন। নিচে এমন কয়েকটি আইন/নীতিমালার উল্লেখ করছি।

ভূমি

- রাষ্ট্রীয় অধিকার ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (সূত্রঃ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫) ধারা-৯৭: আদিবাসীদের দ্বারা ভূমি হস্তান্তরে বিধিনিষেধ

বন ও পরিবেশ

বন ও পরিবেশ-সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আইনকানুন/নীতিগুলো আদিবাসীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। কয়েকটির কথা বলা যায়:

- ✓ বন মহাপরিকল্পনা ১৯৯৩-২০১৪
- ✓ বন আইন, ১৯২৭
- ✓ ধারা ৩-২০ আদিবাসীদের অধিকার স্বীকার করে
- ✓ ধারা ২৬-২ ও ২৮-এ বন ব্যবস্থাপনায় আদিবাসীদের সম্পৃক্ত করার সুযোগ আছে
- ✓ জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৪; ব্যক্তিগত বন অধ্যাদেশ, ১৯৫৯
- ✓ বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পাহাড় কাটা-সংক্রান্ত আইনগুলো
- ✓ জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা ১৯৯৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম

- ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি (চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস ম্যানুয়াল নামে পরিচিত)– ভূমি ও বন ব্যবহারে আদিবাসীদের প্রথাগত এবং বিশেষ অধিকারের স্বীকৃতি আছে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম (ভূমি অধিগ্রহণ) রেগুলেশন, ১৯৫৮
- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৬
- ভূমি রেকর্ড (পার্বত্য চট্টগ্রাম) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪
- তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন (১৯৮৯): স্থানীয় সরকার গঠনের উদ্যোগ
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, ১৯৯৭: স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সাল থেকে সংগ্রামে রত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৭ সালে। এর ফলে এই অঞ্চলকে উপজাতি-অধ্যুষিত হিসেবে বিচার করে এর বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। স্থানীয় সরকার গঠন ও ভূমি সমস্যা সমাধানে কিছু আইন হয়:
    - ✓ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮
    - ✓ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১
    - ✓ জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০: এই নীতিতে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। আদিবাসী প্রান্তিক শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থার কথা আছে।
    - ✓ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০: এই আইনের প্রস্তাবনা অংশে বলা আছে, ‘বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে’ আইনটি প্রণীত হয়েছে।

শ্রমিকস্বার্থ

- বাংলাদেশ চা-শ্রমিক কল্যাণ ফান্ড অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৬ (অর্ডিন্যান্স নং LXII ১৯৮৬)

প্রাসঙ্গিক কিছু নীতিমালা ও পরিকল্পনা

- ন্যাশনাল এডাপটেশন প্ল্যান অব বাংলাদেশ (NAP-2023-2050): জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলার জন্য করা বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি এই জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীকে (ethnic communities) সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া/সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী (socially disadvantaged groups) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও

অন্তর্ভুক্তি এবং বৈচিত্র্য, চাহিদা ও ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে আমলে নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

- স্ট্যান্ডিং অর্ডারস অন ডিজাস্টার, ২০১৯: ২০১৯ সালে বাংলাদেশে দুর্যোগ মোকাবিলায় স্ট্যান্ডিং অর্ডারস রিভিউ করা হয়। এতে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও এজেন্সিকে 'সামাজিক অন্তর্ভুক্তির নীতি অনুসারে নারী, শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং অন্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং মোকাবিলার জরুরি পরিকল্পনা (emergency response) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন' করতে বলা হয়েছে। (পৃ. ১২২, পয়েন্ট 'S')
- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০১৫ ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১৬-২০২১: এতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের অবহেলিত ও সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের খাদ্য-দারিদ্র্যের বিষয়টি আলাদাভাবে বলা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইন ও ঘোষণা

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলও ছাড়াও আরও কিছু সনদ ও ঘোষণা গুরুত্বপূর্ণ।

- ১৯৫৭ সালের আদিবাসী ও উপজাতি-সংক্রান্ত আইএলও সনদ বা কনভেনশন ১০৭
  - ✓ অনুচ্ছেদ ১০ ও ১১: দীর্ঘদিনের ভোগদখলি সম্পত্তি ও জমির ওপর ব্যক্তির এবং যৌথ মালিকানার স্বীকৃতি।
  - ✓ অনুচ্ছেদ ১৩: আদিবাসীদের ভূমি ব্যবহার ও মালিকানা হস্তান্তরের প্রথার প্রতি শ্রদ্ধার স্বীকৃতি।
  - ✓ বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে এটা অনুসমর্থন করেছে।
- ১৯৮৯ সালের আদিবাসী ও উপজাতিসংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ১৬৯
  - ✓ অনুচ্ছেদ ১৪: আদিবাসীদের দখলে থাকা জমির মালিকানা ও দখল অব্যাহত রাখা এবং যে জমিতে দখল নেই, কিন্তু যেটা জীবিকা বা রীতিপ্রথার জন্য ব্যবহারে আছে, তারও অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। দেশের সরকারকে এসব কার্যকর করার দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে।
- জীববৈচিত্র্য কনভেনশন
  - ✓ ৮(জে): আদিবাসীদের প্রথাগত জ্ঞানকে শ্রদ্ধা ও সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে।
- রিও ঘোষণা এবং অ্যাজেন্ডা-২১
  - ✓ ভূমি, প্রথাগত জ্ঞান ও টেকসই উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কল্যাণের কথা বলা হয়েছে।

- আদিবাসীদের অধিকারসংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণা ২০০৭
    - ✓ অনুচ্ছেদ ১০: আদিবাসীদের তাদের ভূমি বা বসবাসের অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না; স্থানান্তর করতে হলে পূর্বসম্মতি এবং ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

> ‘সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্যদের ঐতিহ্যগতভাবে অধিকৃত ভূমির ওপর যৌথ কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করতে হবে।’
>
> অনুচ্ছেদ ১১, আদিবাসী ও উপজাতি-সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ১০৭

- **নাগোয়া প্রটোকল, ২০১০**
    - ✓ এটি জীববৈচিত্র্য কনভেনশনের একটি পরিপূরক চুক্তি। এতে প্রথাগত জ্ঞান ও জেনেটিক সম্পদের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
- **আল্টা আউটকাম ডকুমেন্ট, ২০১৩**
    - ✓ আদিবাসী জনগণের ভূমি ও সম্পদের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
    - ✓ ইউনাইটেড নেশনস্ আউটকাম ডকুমেন্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন ইনডিজেনাস পিপলস (২০১৪)
    - ✓ জাতিসংঘের উচ্চপর্যায়ের এই বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমি অধিকার এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।
- **প্যারিস চুক্তি, ২০১৫**
    - ✓ আর্টিকেল ৭(৫): ‘পক্ষসমূহ স্বীকার করে যে অভিযোজন কার্যক্রম একটি লিঙ্গ-সংবেদনশীল, অংশগ্রহণমূলক এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে, যা ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী, সম্প্রদায় এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থাকে বিবেচনায় নেবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আদিবাসী জনগণের প্রথাগত জ্ঞান এবং স্থানীয় জ্ঞান ব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে, যাতে অভিযোজনকে প্রাসঙ্গিক সামাজিক-অর্থনৈতিক নীতিমালা ও কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করা যায়।’

- **ইউনেসকো পলিসি অন এনগেইজিং উইথ ইনডিজেনাস পিপলস, ২০১৭**
    - ✓ ইউনেসকোর সকল কার্যক্রমে আদিবাসী জনগণের অংশগ্রহণ, জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।
- **জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের 'আদিবাসী জনগণের অধিকার' সম্পর্কিত প্রস্তাব, ২০২৩**
    - ✓ আদিবাসী জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য প্রস্তাবিত একটি নীতিমালা।
    - ✓ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের 'আদিবাসী জনগণের অধিকার' সম্পর্কিত প্রস্তাব, ২০২৩
    - ✓ এই প্রস্তাবে আদিবাসী জনগণের প্রতিনিধিত্ব এবং অংশগ্রহণের অধিকারের প্রতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করে।

ওয়েবসাইটে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা

আদিবাসী বিষয়ে কিছু ওয়েবসাইট হয়তো ইতিবাচক প্রচারণা বা ক্যাম্পেইন/অ্যাডভোকেসি-ধর্মী। বাংলাদেশের আদিবাসীদের পরিস্থিতি নিয়ে লেখা হয়, এমন বেশ কিছু ওয়েবসাইট আপনি পেতে পারেন। বিভিন্ন ব্লগও আছে। তবে মনে রাখা দরকার, যেকোনো ওয়েবসাইটের নির্ভরযোগ্যতা বিচার করতে হবে। কারা সেটি পরিচালনা করছেন, তাঁদের পরিচিতি বা সংশ্লিষ্টতা কী, সেটা বুঝে দেখা দরকার। তথ্য কবে হালনাগাদ করা, সেটা দেখতে হবে। তারপর সেই উৎসের পরিচিতিসহ তাদের দেওয়া তথ্য ব্যবহার করা যায়। এ ছাড়া প্রণয়নকারী সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটে পাওয়া সনদ, আইন বা দলিল জাতীয় তথ্য বাদে, অন্য যেকোনো ওয়েবসাইটের সব তথ্য নিজে যাচাই করবেন এবং সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেবেন। মানবাধিকার বা অন্য ক্যাম্পেইনজাতীয় তথ্য এক পক্ষের বক্তব্য হিসেবে নিয়ে পাল্টাপাল্টি যাচাই করবেন। ব্লগের কোনো কথা কখনোই ‘তথ্য’ হিসেবে নেবেন না। উইকিপিডিয়ার তথ্য নেবেন না, তবে সেখানে দেওয়া সূত্র বিচার ও যাচাই-বাছাই করে তথ্য নিতে পারেন।

সহায়ক তথ্যপঞ্জি

এই বই লিখতে গিয়ে যেসব বই/গবেষণাপত্র/নিবন্ধের সহায়তা নেওয়া হয়েছে, নিচে তার তালিকা দেওয়া হলো। আদিবাসী-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে এসব বইপত্র প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র হতে পারে।

১. জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২: জাতীয় প্রতিবেদন (ভলিউম ১)

২. জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১: জাতীয় প্রতিবেদন (ভলিউম ১)

৩. বাংলাদেশের সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন): রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, ধারা ২৩ক

৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ (আইন নং ২৫, ২০১০)

৫. ২০১৯ সালের ২৩ মার্চ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন। [লিংক: https://share.google/GG1vVdEvyacjJip9Q; ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে দেখা হয়েছে]

৬. Occupational hardships of minority communities in Bangladesh, গবেষণাটি করেছে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ক্রিশ্চিয়ান এইড, ২০২২

৭. ন্যাশনাল এডাপটেশন প্ল্যান অব বাংলাদেশ (NAP-2023-2050), প্রকাশনায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর, ২০২২

৮. স্ট্যান্ডিং অর্ডারস অন ডিজাস্টার ২০১৯, ৫ম অধ্যায় (পৃষ্ঠা-১২২), প্রকাশনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০২০

৯. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০১৫, প্রকাশনায় সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০১৭

১০. 'বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও বাস্তবায়ন: অগ্রগতি ও করণীয়', সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট (এসএসপিএস) প্রোগ্রাম, প্রকাশনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সহায়তায় অস্ট্রেলিয়ান এইড এবং ইউএনডিপি, মার্চ ২০২৪

১১. 'বাংলাদেশের আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহ', প্রশান্ত ত্রিপুরা– অষ্টম অধ্যায়, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান পরিচিতি; প্রকাশক: উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, ২০০১। প্রকাশের পর লেখক লেখাটি আরও কিছু সম্পাদনা করেছেন।

১২. আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ ও বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণ, প্রশান্ত ত্রিপুরা– আন্তর্জাতিক বিশ্ব আদিবাসী বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে পঠিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকা, ১৯৯৩; ২০০৩ সালে হালনাগাদ করা

১৩. 'এথনিক কমিউনিটিস অব বাংলাদেশ', কিবরিয়াউল খালেক– প্রথম অধ্যায়, বাংলাদেশ ল্যান্ড ফরেস্ট অ্যান্ড ফরেস্ট পিপল, প্রকাশক: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা, ১৯৯৫

১৪. আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫, মেসবাহ কামাল, জাহিদুল ইসলাম ও সুগত চাকমা সম্পাদিত– প্রকাশক: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭

১৫. পপুলেশন সেনসাস ২০০১, ন্যাশনাল সিরিজ, ভলিউম-১ ও বিভিন্ন কমিউনিটি সিরিজ– প্রকাশক: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা, ২০০৭

১৬. বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, রামকান্ত সিংহ– প্রকাশক: এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০০১

১৭. সংহতি ২০০৬/সলিডারিটি ২০০৬, সঞ্জীব দ্রং সম্পাদিত– প্রকাশক: বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, ২০০৬

১৮. সিলেটের নিঃস্ব আদিবাসী পাত্র, রতন লাল চক্রবর্ত্তী– প্রকাশক: মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮

১৯. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি, ফিলিপ গাইন ও পার্থ শঙ্কর সাহা সম্পাদিত– প্রকাশক: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা, ২০০৭

২০. দ্য স্ট্রং উইমেন অব মধুপুর, রবিন্স বার্লিং– প্রকাশক: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৭

২১. দ্য খাসিস অব বাংলাদেশ, ড. থমাস কস্টা ও অনিন্দিতা দত্ত– প্রকাশক: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা, ২০০৭

২২. বাংলাদেশের উপজাতিদের আইন, রামকান্ত সিংহ– প্রকাশক: এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০০৩

২৩. ভূমি, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদে আদিবাসীর অধিকার, বাহ্‌রীন খান, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি, বেলা– এমআরডিআই আয়োজিত সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থাপিত তথ্যপত্র, সাভার, ২০০৮

২৪. লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অন প্রটেকশন অ্যান্ড প্রমোশন অব ইনডিজেনাস পিপলস রাইটস: ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড ন্যাশনাল পারস্পেকটিভ, আবদুল্লাহ্‌ আল ফারুক– এমআরডিআই আয়োজিত সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থাপিত তথ্যপত্র, সাভার, ২০০৮

২৫. সিচুয়েশন অব আদিবাসিজ: কেস স্টাডিজ ফ্রম সিএইচটি অ্যান্ড মধুপুর, সাদেকা হালিম– এমআরডিআই আয়োজিত সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থাপিত তথ্যপত্র, সাভার, ২০০৮

২৬. দ্য চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস, বাংলাদেশ: জাস্টিস ডিনাইড, আমেনা মহসীন– এমআরডিআই আয়োজিত সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থাপিত তথ্যপত্র, সাভার, ২০০৮

২৭. 'চ্যালেঞ্জেস ফর জুরিডিক্যাল প্লুরালিজম অ্যান্ড কাস্টমারি ল'জ অব ইনডিজেনাস পিপলস: দ্য কেস অব দ্য চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস, বাংলাদেশ', রাজা দেবাশীষ রায়– চন্দ্রা কে. রায় সম্পাদিত ডিফেন্ডিং ডাইভারসিটি: কেস স্টাডিজ– প্রকাশক: সামি কাউন্সিল, সুইডিশ সেকশন, সুইডেন, ২০০৪

২৮. মাইগ্রেশন ল্যান্ড অ্যালিয়েনেশন অ্যান্ড এথনিক কনফ্লিক্ট, স্বপন আদনান– প্রকাশক: রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাডভাইজরি সার্ভিসেস, ঢাকা, ২০০৪

২৯. মেলভিন মেনচির'স নিউজ রিপোর্টিং অ্যান্ড রাইটিং, (সপ্তম ও একাদশ সংস্করণ), মেলভিন মেনচির– কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়– প্রকাশক: ম্যাকগ্র-হিল, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৯৭ ও ২০০৮

৩০. জনসংযোগ হ্যান্ডবুক, এম. ইমামুল হক– প্রকাশক: ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই), ঢাকা, ২০০৭

দূরত্ব পারস্পরিক
ব্যাপার। দূরত্ব তথা
ঘাটতি ও সমস্যাগুলো
দূর করার সঠিক উপায়
এবং কৌশল ঠিক
করতে হবে।
পারস্পরিক আস্থা ও
বিশ্বাস এবং সহায়তার
ভিত্তি তৈরি করা
জরুরি। ...